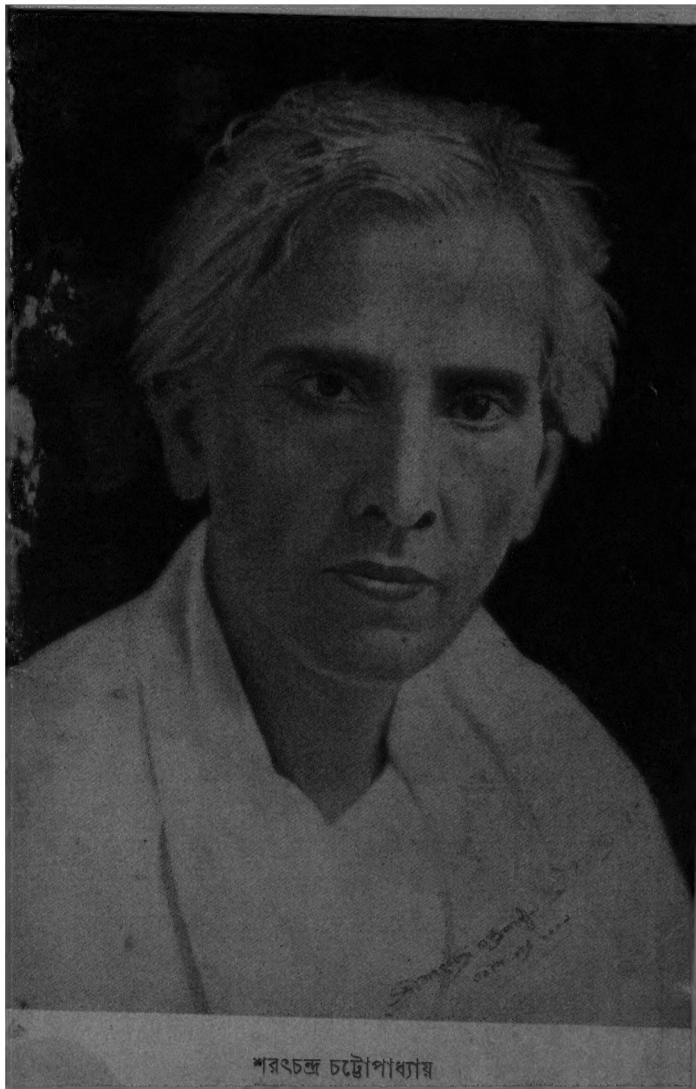


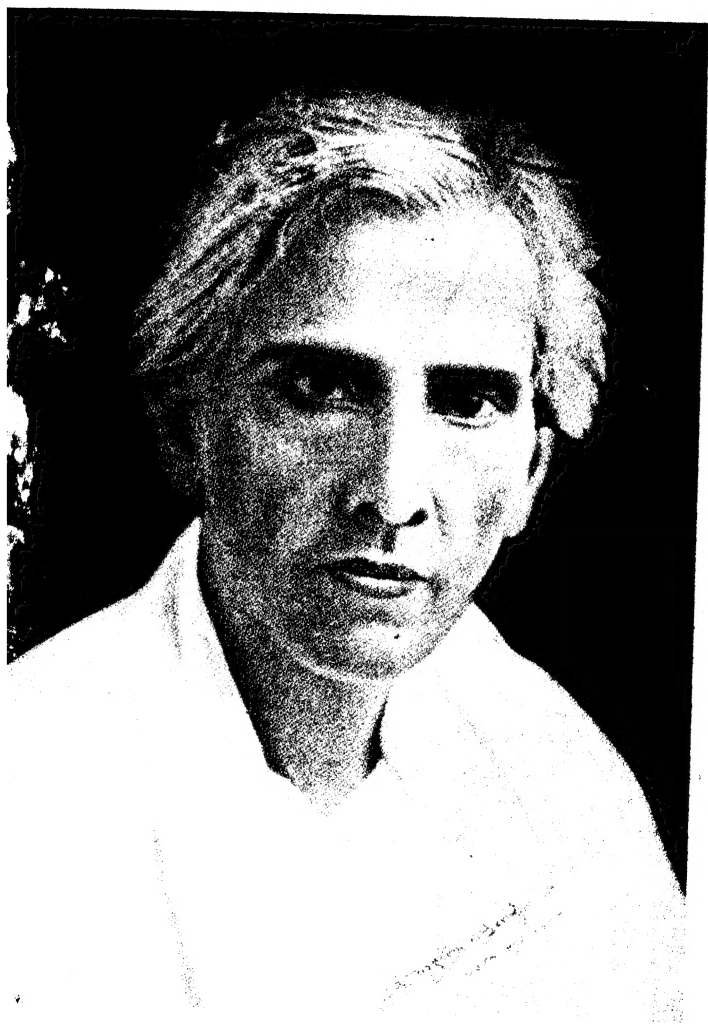
ছবি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-১-১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট ... কলিকাতা - ৬



শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



পরশু চট্টোপাধ্যায়

ছবি

১

এই কাহিনী যে সময়ের, তখনও ব্রহ্মদেশ ইংরাজের অধীনে আসে নাই। তখনও তাহার নিজের রাজ্যাঙ্গী ছিল, পাত্র-মিত্র ছিল, সৈন্ত-সামন্ত ছিল; তখন পৃথক্ তাহাবা নিজেদের দেশ নিজেরাই শাসন করিত।

মান্দালে রাজধানী, কিন্তু রাজবংশের অনেকেই দেশের বিভিন্ন সহরে গিয়া বসবাস করিতেন।

এমনি বোধ হয় একজন কেহ বহুকাল পূর্বে পেগুর কোশ-পাচেক দক্ষিণে ইমেদিন গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।

তাদের প্রকাণ্ড অটালিকা, প্রকাণ্ড বাগান, বিস্তর টাকা-কড়ি, মস্ত জমিদারী। এই সকলের মালিক যিনি, তাঁর একদিন যখন পরকালের ডাক পড়িল, তখন বন্ধুকে ডাকিয়া কহিলেন, বা-কো, ইচ্ছে ছিল তোমার ছেলের সঙ্গে আমাব মেয়ের বিবাহ দিয়া যাইব। কিন্তু সে সময় হইল না। মা-শোয়ে রহিল, তাহাকে দেখিও।

ইহার বেশি বলার তিনি প্রয়োজন দেখিলেন না। বা-কো তাঁর ছেলে-বেলার বন্ধু। একদিন তাহারও অনেক টাকার সম্পত্তি ছিল, শুধু ফয়ার মন্দির গড়াইয়া আর ভিক্ষা খাওয়াইয়া আজ কেবল সে সর্বস্বান্ত নয়, ঋণগ্রস্ত। তথাপি এই লোকটাকে তাহাব যথাসর্বস্বের সঙ্গে একমাত্র

কথাকে নির্ভয়ে সঁপিয়া দিতে এই মুমূর্ষুব লেশমাত্র বাধিল না। বন্ধুকে চিনিয়া লইবার এত বড় স্বযোগই তিনি এ জীবনে পাইয়াছিলেন। কিন্তু এ দায়িত্ব বা-কোকে অধিক দিন বহন করিতে হইল না। তাবও ও-পাণের শমন আসিয়া পৌছিল এবং সেই মহামাত্র পনওয়ার মাথায় করিয়া বৃদ্ধ বৎসর না ঘুরিতেই যেখানের ভাব সেখানেই ফেলিয়া বাধিয়া অজানার দিকে পাড়ি দিলেন।

এই ধর্মপ্রাণ দরিদ্র লোকটিকে গ্রামের লোক যত ভালবাসিত, শ্রদ্ধা-ভক্তি কবিত, তেমনি প্রচণ্ড আগ্রহে তাহাবা ইহাব মৃত্যু উৎসব সুরু করিয়া দিল।

বা কোর মৃতদেহ মালা চন্দনে সজ্জিত হইয়া পালায় শবান বহিল এবং নিচে খেলা-বুলা, নৃত্য-গীত ও আহাব বিহারের শ্রোত বাড়ি-দিন অবিরাম বহিতে লাগিল। মনে হইল ইহার বুঝি আব শেষ হইবে না।

পিতৃ-শোকের এই উৎকর্ষ আনন্দ হইতে স্ফৰ্ণকালের জন্য কোনমতে পলাইয়া বা-খিন একটা নিজ্জন গাছের তলায় বসিয়া কাঁদিতেছিল, হঠাৎ চমকিয়া ফিবিয়া দেখিল, মা শোষে তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে ওড়নার প্রান্ত দিশ নিঃশব্দে তাহার চোখ মুছাইয়া দিল এবং পাশে বসিয়া তাহার ডান হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুপি চুপি বলিল, বাবা মরিয়াছেন, কিন্তু তোমাব মা শোষে এখনও বাঁচিয়া আছে।

বা-খিন ছবি আঁকিত। তাহার শেষ ছবিখানি সে একজন সওদাগরকে দিয়া বাজার দরবালে পাঠাইয়া দিয়াছিল। রাজা ছবিখানি গ্রহণ করিয়াছেন এবং খুদী হইয়া রাজ-হস্তের বহুমূল্য অঙ্গুরী পুষ্পাব কবিয়াছেন।

আনন্দে মা-শোষেব চোখে জল আসিল, সে তাহার পাশে দাঁড়াইয়া মৃদু-কণ্ঠে কহিল, বা খিন জগতে তুমি সকলের বড় চিত্রকর হইবে।

বা-খিন হাসিল, কহিল, বাবাব ঋণ বোধ হয় পরিণোধ করিতে পারিব।

উত্তরাবিকাবহুদে মা-শোষেই তাহার একমাত্র মহাজন। তাই এ কথাই সে সকলের চেয়ে বেশি লজ্জা পাইত। বলিল, তুমি বার বাব এমন-কিিয়া খোঁটা দিলে আর আমি তোমাব কাছে আসিব না।

বা-খিন চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু ঋণেব দায়ে পিতার মুক্তি হইবে না, এত বড় বিপত্তির কথা স্বরণ কবিয়া তাহার অন্তরটা যেন শিহনিয়া উঠিল।

বা-খিনের পবিত্রম আজ-কাল অত্যন্ত বাড়িয়াছে। জাতক হইতে একখানা নতুন ছবি আঁকিতেছিল, আজ সারাদিন মুখ তুলিয়া চাহে নাই।

মা-শোষে প্রত্যহ যেমন আদিত, আজিও তেমনি আদিয়াছিল। বা-খিনেব শোবাব ঘর, বসিবার ঘর, ছবি আঁকিবার ঘর সমস্ত নিজের হাতে সাজাইয়া গুছাইয়া যাইত। চাকর-দাসীর উপর এ কাজটির ভার দিতে তাহাব কিছুতেই সাহস হইত না।

সম্মুখে একথানা দর্পণ ছিল, তাহারই উপর বা-খিনের ছায়া পড়িয়াছিল। মা-শোয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, বা-খিন, তুমি আমাদের মত মেয়েমানুষ হইলে এত দিন দেশের রাণী হইতে পারিত।

বা-খিন মুখ তুলিয়া হাসিমুখে বলিল, কেন বল ত ?

রাজা তোমাকে বিবাহ করিয়া সিংহাসনে লইয়া যাইতেন। তাঁহার অনেক রাণী, কিন্তু এমন স্বভ, এমন চুল, এমন মুখ কি তাঁহাদের কাহারও আছে ? এই বলিয়া সে কাজে মন দিল, কিন্তু বা-খিনের মনে পড়িতে লাগিল, মান্দালেতে সে যখন ছবি ঝাঁক শিখিতেছিল, তখনও এমনি কথা তাহাকে মাঝে মাঝে শুনিতে হইত।

তখন সে হাসিয়া কহিল, কিন্তু রূপ চুরি করার উপায় থাকিলে তুমি বোধ হয় আমাকে ফাঁকি দিয়া এত দিনে রাজার বামে গিয়া বসিতে।

মা-শোয়ে এই অভিযোগের কোন উত্তর দিল না, কেবল মনে মনে বলিল, তুমি নারীর মত দুর্বল, নারীর মত কোমল, তাহাদের মতই হৃন্দর—তোমার রূপের সীমা নাই।

এই রূপের কাছে সে আপনাকে বড চোট মনে করিত।

৩

বসন্তের প্রারম্ভে এই ইমেদিন গ্রামে প্রতি বৎসর অত্যন্ত সমারোহের সহিত ঘোড়-দৌড় হইত। আজ সেই উপলক্ষে গ্রামান্তের মাঠে বহু জনসমাগম হইয়াছিল।

মা-শোয়ে ধীরে ধীরে বা-খিনের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। সে একমনে ছবি আঁকিতেছিল, তাই তাহার পদশব্দ শুনিতে পাষ্টল না।

মা-শোয়ে কহিল, গামি আসিয়াছি, ফিরিয়া দেখ। বা-খিন চকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল, বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ এত সাজ-সজ্জা কিসের ?

বাঃ, তোমাব বুঝি মনে নাই, আজ আমাদের ঘোড়-দোড ? যে জ্বরী হইবে, সে ত আজ আমাকেই মালা দিবে।

কই, তা ত শুনি নাই, বলিয়া বা-খিন তাহার তুলিটা পুনরায় তুলিয়া পইতে যাইতেছিল, মা-শোয়ে তাহার গলা জড়াইয়া বরিয়া কহিল, না শুনিয়াছ নেই নেই। কিন্তু তুমি ওঠ—আর কত দেরি করিবে ?

এই ছটিতে প্রায় সমবয়সী—হয় ত বা-খিন দুই-চারি মাসের বড় হইতেও পাবে, কিন্তু শিশুকাল হইতে এমনি করিয়াই তাহারা এই উনিশটা বছর কাটাইয়া দিয়াছে। খেলা করিয়াছে, বিবাদ করিয়াছে, মারপিট করিয়াছে—আব ভালবাসিয়াছে।

সম্মুখের প্রকাণ্ড মূর্ক্বে দুটি মুখ ততক্ষণ দুটি প্রস্থুটিত গোলাপের রক্ত কুটিয়া উঠিয়াছিল, বা-খিন দেখাইয়া কহিল, ঐ দেখ—

মা-শোয়ে কিছুক্ষণ নীরবে ঐ দুটির পানে অতৃপ্ত নবনে চাহিয়া রহিল। অকস্মাৎ আঙ্গ প্রথম তাহার মনে হইল, সেও বড় জন্মব। আবেশে দুই চক্ষু তাহার মুদিয়া আসিল, কানে কানে বলিল, আমি যেন চাঁদের কলঙ্ক। বা খিন আরও কাছে তাহার মুখখানি টানিয়া আনিয়া বলিল, না, তুমি চাঁদের কলঙ্ক নও—কারও কলঙ্ক নও—তুমি চাঁদের কোমুদীটি। একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ।

কিন্তু ন্যূন মেলিতে মা-শোয়ের সাহস হইল না, সে তেমনি হুচক্ষু
মুদ্রিয়া রহিল।

হয় ত এমনি করিয়াই বতক্ষণ কাটিত, কিন্তু একটা প্রকাণ্ড নর
নারী'ব দল নাচিয়া গাহিয়া জুমুখের পথ দিয়া উৎসবে যোগ দিতে
চলিয়াছিল। মা-শোয়ে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, চল,
সময় হইয়াছে।

কিন্তু আমাব যাওয়া যে একবারে অসম্ভব মা শোয়ে।

কেন ?

এই ছবিখানি পাচ দিনে শেষ কবিয়া দিব চুক্তি কবিয়াছি।

না দিও ?

সে মান্দানে চলিয়া যাইবে, স্তব্ধ ছবিও লইবে না, টাকাও দিবে না।

টাকা'ব উল্লেখ মা-শোয়ে কষ্ট পাইত, লজ্জাবোধ কবিত। বাগ
কবিয়া বলিল, কিন্তু তা বলিয়া ত তোমাকে এমন প্রাণপাত পবিশ্রম
করিতে দিতে পাবি না।

বা খিন এ কথা'ব কোন উত্তর দিল না। পিতৃরূপ স্মরণ কবিয়া
তাহার মুখের উপর যে মান ছায়া পড়িল, তাহা আব একজনের দৃষ্টি
এড়াইল না।

কহিল, আমাকে বিক্রী করিও, আমি দ্বিগুণ দাম দিব।

বা-খিনে'ব তাহাতে সন্দেহ ছিল না, হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু
করিবে কি ?

মা-শোয়ে গলার বজুমূল্য হাব দেখাইয়া বলিল, ইহাতে ষতগুলি মুক্তা,
ষতগুলি চুনি আছে, সবগুলি দিয়া ছবিটিকে বাধাইয়া, তার পরে শোবার
ঘরে আমার চোখের উপর টাঙাইয়া রাখিব।

তার পরে ?

তার পরে বেদিন বাত্রে খুব বড় চাঁদ উঠিবে, আর খোলা জানালার ভিতর দিবা তাহাব জ্যোৎস্নাব আলো তোমার ঘুমন্ত মুখের উপর খেলা কবিতাে থাকিবে—

তাব পরে ?

তাব পরে তোমাব ঘুম ভািয়—

কথাটা শেষ হইতে পাইল না। নিচে মা-শোয়ের গকব গাভী অপেক্ষা কবিতােছিল, তাহাব গাডোয়ানাব উচ্চকণ্ঠেব আহবান শোনা গেণা।

বা-খিন বাস্ত হইযা কহিল, তাব পবেব কথা পবে শুনিব কিন্তু আর নয। তোমাব সময হইযা গিয়াছে—শীঘ্র যাও।

কিন্তু সময বহিষা, যাইবাব কোন লক্ষণ মা-শোযেব আচরণে দেখা গেল না। ক'ণ সে আবও ভাল কবিশ বহিষা কহিল, আমার শরীর খাবাপ বোব হইতোহু, আমি যাইব না।

যাইবে না ? কথা দিয়াহু, স্কলে উদ্গ্রীব হইয়া তোমাব প্রতীক্ষা কবিতােছে, তা জানো ?

মা শোযে প্রবল-বেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, তা করক। চুক্তি-ভঞ্ের অত লক্ষ্য আমাব নাই—আমি যাইব না।

ছিঃ—

তবে তুমিও চল ?

পারিলে নিশ্চয় যাইতাম, কিন্তু তাই বলিয়া আমার জ্ঞ তোমাকে আমি সত্য ভঙ্গ কবিতাে দিব না। আর দেবি কবিও না, যাও।

তাহার গম্ভীর মুখ ও শাস্ত দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনিয়া মা-শোয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। অভিमानে মুখখানি ঘান করিয়া কহিল, তুমি নিজের স্তবধার জ্ঞাত আমাকে দূর করিতে চাও। দূর আমি হইতেছি, কিন্তু আর কখনও তোমার কাছে আসিব না।

এক মুহূর্তে বা খিনের কর্তব্যেব দৃঢ়তা স্নেহেব জলে গলিয়া গেল, সে তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া সহাস্ত্রে কহিল, এত বড় প্রতিজ্ঞাটা করিয়া বসিও না মা-শোয়ে—আমি জানি, ইহাব শেষ কি হইবে। কিন্তু আর ত বিলম্ব করা চলে না।

মা-শোয়ে তেমনি বিষন্ন মুখেই উত্তর দিল, আমি না আসিলে খাওয়া পরা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বিষয়ে তোমার যে দশা হইবে, সে আমি সহিতে পারিব না জানো বলিয়াই আমাকে তুমি তাড়াইতে পারিলে। এই বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।



প্রায় অপরাহ্ন-বেলায় মা-শোয়ের কপা-বাধানো মন্ব পঙ্খী গো-বান যখন ময়দানে আসিয়া পৌছিল, তখন সমবেত জনমণ্ডলী প্রচণ্ড কলরবে কোলাহল করিয়া উঠিল।

সে যুবতী, সে সুন্দরী, সে অবিবাহিতা, এবং বিপুল ধনের অধিকারিণী। মানবের যৌবন-রাজ্যে তাহার স্থান অতি উচ্চে। তাই এখানেও বহু-মানবের আসনটি তাহারই জ্ঞাত নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সে আজ পুষ্পমালা বিতরণ করিবে। তাহার পর যে ভাগ্যবান এই রমণীর শিশে জন্মমালাটি

সর্বোপায়ে পরাইয়া দিতে পারিবে, তাহার অদৃষ্টই আজ যেন জগতে হিংসা করিবার একমাত্র বস্তু।

সজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে রক্তবর্ণ পোষাক সওয়ারগণ উৎসাহ ও চাঞ্চল্যের আবেগ কণ্ঠে সংযত করিয়াছিল। দেখিলে মনে হয়, আজ সংসারে তাহাদের অসাধ্য কিছু নাই।

ক্রমশঃ সময় আসন্ন হইয়া আসিল এবং যে কয়জন অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে আজ উদ্যত, তাহারা সারি দিয়া দাঁড়াইল এবং ক্ষণেক পরেই ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে মরি-বাঁচি-জ্ঞানশূন্য হইয়া এই কয়জন ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

ইহা বীরত্ব, ইহা যুদ্ধের অংশ। মা-শোয়ের পিতৃপিতামহগণ সকলেই যুদ্ধব্যবসায়ী, ইহার উন্নত বেগ নারী হইলেও তাহার ধমনীতে বহমান ছিল। যে জয়ী হইবে, তাহার সমস্ত হৃদয় দিয়া সংবর্দ্ধনা না করিবার সাধ্য তাহার ছিল না।

তাই যখন ভিন্ন-গ্রামবাসী এক অপরিচিত যুবক আরক্তদেহে, কম্পিত-মুখে, ক্রন্দ-সিক্ত হস্তে তাহার শিরে জয়মালা পরাইয়া দিল, তখন তাহার আগ্রহের আতিশয্য অনেক সম্ভ্রান্ত রমণীর চক্ষেই কটু বলিয়া ঠেকিল।

ফিরিবার পথে সে তাহাকে আপনার পার্শ্বে গাড়ীতে স্থান দিল এবং সম্বল-বণ্টন করিল, আপনার জন্ত আমি বড় ভয় পাইয়াছিলাম। একবার এমনও মনে হইয়াছিল, অত বড় বড় উঁচু গ্রাচীর কোনরূপে যদি কোথাও পা ঠেকিয়া যায়!

যুবক বিনয়ে ঘাড় হেঁট করিল, কিন্তু এই অপমসাহসী বলিষ্ঠ বীরের সহিত মা-শোয়ে মনে মনে তাহার সেই দুর্বল, কোমল ও সর্ববিধে অপটু চিত্রকরের সহিত তুলনা না করিয়া পারিল না।

এই যুবকটির নাম পো-খিন। কথায় কথায় পরিচয় হইলে জানা গেল, ইনিও উচ্চবংশীয়, ইনিও ধনী এবং তাহাদেরই দূর আত্মীয়।

মা-শোষে আজ অনেককেই তাহার প্রাসাদে সাক্ষা-ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, তাহারা এবং আরও বহুনোক ভিড় কবিয়া গাভীর সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল। আনন্দের আগ্রহে, তাহাদের তাণ্ডব-নৃত্যোৎসবিত ধূলার মেঘে ও সঙ্গীতের অসহ্য নিনাদে সন্ধ্যার আকাশ তখন একেবারে আচ্ছন্ন অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল।

এই ভয়ঙ্কর জনতা যখন তাহাব বাটীর সম্মুখ দিয়া অগ্রসর হইয়া গেল, তখন স্বর্ণকালের নিমিত্ত বা খিন তাহাব কাজ বেলিয়া জানালায় আসিয়া নীরবে চাহিয়া রহিল।



সাক্ষা-ভোজের প্রসঙ্গে পবদিন মা-শোষে বা খিনকে কহিল, কাস সন্ধ্যাটা আনন্দে কাটিল। অনেককেই দয়া কবিয়া আসিয়াছিলেন। শুধু তোমাব সময় ছিল না বলিয়া তোমাকে ডাকি নাই।

সেই ছবিটা সে প্রাণপণে শেখ করিতেছিল, মুখ না তুলিয়াই বলিল, ভালই করিয়াছিলে। এই বলিয়া সে কাজ করিতে লাগিল।

বিশ্বয়ে মা-শোষে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। কথার ভাবে তাহাব পেট ফুলিতেছিল, কাল বা-খিন কাজের চাপে উৎসবে যোগ দিতে পারে নাই, তাই আজ অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক গল্প কবিরে মনে কবিয়াই সে আসিয়াছিল, কিন্তু সমস্তই উন্টা বকমের হইয়া গেল। কেবল একা একা প্রলাপ চলিতে পারে, কিন্তু আলাপের কাজ চলে না, তাই সে শুধু শুক্ক হইয়া বসিয়া রহিল, কিছুতেই অপর পক্ষের প্রবল উদ্যম ও গভীর নীর-

বতীর রুদ্ধ দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে আজ ভরসা করিল না। প্রতিদিন যে সকল ছোটখাটো কাজগুলি সে করিয়া/যায়, আজ সেগুলিও পড়িয়া রহিল—কিছুতেই হাত দিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। এইভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল—একবার বা-খিন মুখ তুলিল না, একবার একটা প্রশ্ন করিল না। কালকের অতবড় ব্যাপারের প্রতিও তাহার যেমন লেশ-মাত্র কৌতূহল নাই, কাজের ফাঁকে হাঁফ ফেলিবারও তাহার তেমন অবসর নাই।

বহুক্ষণ পযন্ত নিঃশব্দে কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া থাকিয়া অবশেষে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মূহু-কণ্ঠে কহিল, আজ আমি আসি।

বা-খিন ছবির উপর চোখ রাখিয়াই বলিল, এসো।

যাইবার সময় মা-শোযেব মনে হইল, যেন সে এই লোকটির অন্তরের কথাটা বুঝিয়াছে। জিজ্ঞাসা কবে, একবার সে ইচ্ছাও হইল বটে কিন্তু দুখ খুলিতে পারিল না, নীরবেই বাহির হইয়া গেল।

বাটাতে পা দিয়াই দেখিল, পো-খিন বসিয়া আছে। গত রাত্রির আনন্দ-উৎসবেব জগ্ন ধন্যবাদ দিতে আসিয়াছিল। অতিথিকে মা-শোযে বস্তু করিয়া বসাইল।

লোকটা প্রথমে মা-শোযেব ঐশ্ব্যের কথা তুলিল, পরে তাহার বংশের কথা, তাহার পিতার খ্যাতির কথা, তাহার রাজদ্বারে সম্মানের কথা এমনি কত কি সে অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল।

এ সকল কতক বা সে শুনিল, কতক বা তাহার অগ্রমনস্ক কানে পৌছিল না। কিন্তু লোকটা শুধু বলিষ্ঠ এবং অতি সাহসী ঘোড়-সওয়ারই নয়, সে অত্যন্ত ধূর্ত। মা-শোযেব এই ঔদাসীন্য তাহার অগোচর বহিল না। সে মান্দালের রাজ-পরিবারের প্রসঙ্গ তুলিয়া

অবশেষে যখন সৌন্দর্যের আগোচনা শুরু করিল এবং কৃত্রিম সারল্যে পরিপূর্ণ হইয়া এই রমণীকে লক্ষ্য এবং উপলক্ষ করিয়া ব্যবহার তাহার রূপ ও যৌবনের ইঙ্গিত করিতে লাগিল, তখন তাহার মনে মনে অতিশয় লজ্জা করিতে লাগিল বটে, কিন্তু একটা অপরূপ আনন্দ ও গৌরব অহঙ্কার না করিয়াও থাকিতে পারিল না।

আলাপ শেষ হইলে পো-খিন যখন বিদায় গ্রহণ করিল, তখন আজিকার রাত্রির জগুও সে আহারের নিমন্ত্রণ লইয়া গেল।

কিন্তু চলিয়া গেলে তাহার কথাগুলি মনে মনে আবৃত্তি করিয়া মা-শোয়ের সমস্ত মন ছোট এবং প্রাণিতে ভরিয়া উঠিল এবং নিমন্ত্রণ করিয়া ফেলার জগু বিরক্তি ও বিতৃষ্ণার অবধি রহিল না। সে তাড়াতাড়ি আরও জন-কয়েক বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া চাকর দিয়া চিঠি পাঠাইয়া দিল। অতিথিরা যথাসময়েই হাজির হইলেন এবং আজও অনেক হাসি-তামাশা, অনেক গল্প, অনেক নৃত্য-গীতের সঙ্গে যখন খাওয়া-দাওয়া শেষ হইল, তখন রাত্রি আর বড় বাকি নাই।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া সে শুইতে গেল, কিন্তু চোখে ঘুম আসিল না। কিন্তু বিষয় এই যে, যাহা লইয়া তাহার এতক্ষণ এমন করিয়া কাটিল, তাহার একটা কথাও আর মনে আসিল না। সে সকল যেন কত যুগের পুরানো অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার—এমনি শুষ্ক, এমনি বিরস। তাহার কেবলি মনে পড়িতে লাগিল আর একটা লোককে, যে তাহারই উদ্যান প্রান্তরের একটা নির্জন গৃহে এখন নিব্বিলে আছে—আজিকার এত বড় মাতা-মাতির লেশমাত্রও তাহার কানে যাইবার হয় ত এতটুকু পথও কোথাও খুঁজিয়া পায় নাই।

চিরদিনের অভ্যাস, প্রভাত হইতেই মা শোয়েকে টানিতে লাগিল।
আবার সে গিন্না বা-খিনের ঘরে আনিয়া বসিল।

প্রতিদিনের মত আজিও সে কেবল একটা 'এসো' বলিয়াই তাহার
সহজ অভ্যর্থনা শেষ করিয়া কাজে মন দিল, কিন্তু কাছে বসিয়াও আর
একজনের আজ কেবলি মনে হইতে লাগিল, ওই কৰ্মনিরত নীরব লোকটি
নীরবেই ঘেন বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে।

'অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মা-শোয়ে কথা খুঁজিয়া পাইল না। তার পরে
সংশোধিত কাটাঁইয়া গিজ্ঞাসা করিল, তোমার আর বাকি কত।

অনেক।

তবে এই দুদিন ধরিয়া কি করিলে ?

বা-খিন ইহার জবাব না দিয়া চুরুটের বাক্সটা তাহার দিকে বাড়াইয়া
দিয়া বলিল, এষ্ট মদের গন্ধটা আমি সইতে পারি না।

মা শোয়ে এই ইঙ্গিত বঝিল। জলিয়া উঠিয়া হাত দিয়া বাক্সটা
সজোরে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, আমি সকাল-বেলা চুরুট খাই না—চুরুট
দিয়া গন্ধ ঢাকিবার কাজও করি নাই—আমি ছোটলোকের মেয়ে নই।

বা-খিন নগ্ন তুলিয়া শাস্ত-কঠে কহিল, হয় ত তোমার কাপড়ে কোন-
রূপে লাগিয়াছে, মদের গন্ধটা আমি বানাইয়া বলি নাই।

মা শোয়ে বিছাধেগে উঠিয়া দাঁড়াইল—ভূমি ঘেমন নীচ, তেমন
হিংস্র, তাই আমাকে বিনা দোষে অপমান করিলে। আচ্ছা, তাই
ভাল, আমার জামা-কাপড় তোমার ঘর হইতে আমি চিরকালের জন্য
সরাইয়া গইয়া যাইতেছি। এই বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না

করিয়াই' দ্রুতবেগে ঘব ছাড়িয়া যাইতেছিল, বা-খিন শিঁছনে ডাকিয়া তেমনি সংযতস্বরে বলিল, আমাকে নীচ ও হিংস্রক কেহ কখনও বলে নাই, তুমি হঠাৎ অধঃপথে যাইতে উদ্বৃত্ত হইয়াছ বলিয়াই সাবধান করিয়াছি।

মা-শোয়ে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, অধঃপথে কি কবিয়া গেলাম ?

'তাই আমার মনে হয়।

আচ্ছা, এই মন লইয়াই থাকো, কিন্তু যাহার পিতা আশীর্বাদ রাখিয়া গিয়াছেন, সন্তানের জন্ত অভিশাপ বাখিয়া যান নাই, তাহার সঙ্গে তোমার মনের মিল হইবে না।

এই বলিয়া সে চলিয়া গেল, কিন্তু বা-খিন স্থির হইয়া বসিয়া বহিল। কেহ যে-কোন কারণেই তাহাকে এমন মর্মান্তিক করিয়া বিঁবিতে পারে, এত ভালোবাসা একদিনেই যে এত বড় বিষ হইয়া উঠিতে পারে, ইহা সে ভাবিতেও পারিত না।

মা-শোয়ে বাটী আসিয়াই দেখিল পো-খিন বসিয়া আছে। সে সম্বন্ধে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত মধুর কবিয়া একটু হাস্য করিল।

হাসি দেখিয়া মা-শোয়ের দুই দ্রুত বোদ করি অজ্ঞাতসাবেই কৃত্তিত হইয়া উঠিল। কহিল, আপনার কি বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে ?

না, প্রয়োজন এমন—

তা হইলে আমাব সময় হইবে না, বলিয়া পাশেব সিঁড়ি দিয়া মা-শোয়ে উপরে চলিয়া গেল।

গত নিশার কথা স্মরণ করিয়া লোকটা একেবাবে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিন্তু বেহারাটা স্বমুখে আসিতেই কার্গহাসির সঙ্গে হাতে তাহার একটা টাকা গুঁজিয়া দিয়া শিষ দিতে দিতে বাতির হইয়া গেল।

শিশুকাল হইতে যে দুই জনের কখনও এক মুহূর্তের জ্ঞাত বিচ্ছেদ ঘটে নাই, অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ মা'াধিক কাল গত হইয়াছে, কাহারও সহিত কেহ সাক্ষাৎ করে নাই।

মা শোয়ে এই বলিয়া আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করে যে, এ একপ্রকার ভালোই হইল যে, যে মোহের জাল এই দীর্ঘদিন ধরিয়া তাহাকে কঠিন বন্ধনে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আর তাহার সহিত বিন্দুমাত্র সংস্রব নাই। এই ধনীর কণ্ঠার উদ্দাম প্রকৃতি পিতা বিগ্ৰহমানেও অনেক দিন এমন অনেক কাজ করিতে চাহিয়াছে, যাহা কেবল মাত্র গভীর ও সংযতচিত্ত বা-ধিনের বিরক্তির ভয়েই পারে নাই। কিন্তু আজ সে স্বাধীন—একেবারে নিজের মালিক নিজে। কোথাও কাহারো কাছে আর লেশমাত্র জবাবদিহি করিবার নাই। এই একটিমাত্র কথা লইয়া সে মনে মনে অনেক তোলা-পাড়া, অনেক ভাড়া-গড়া করিয়াছে, কিন্তু একটা দিনের জ্ঞাতও কখনো আপনার হৃদয়ের নিগূঢ়তম গৃহটির দ্বার খুলিয়া দেখে নাই, সেখানে কি আছে! দেখিলে দেখিতে পাইত, এত দিন সে আপনাকেই আপনি ঠকাইয়াছে। সেই নিভৃত গোপন কক্ষে দিবানিশি উভয়ে মুখোমুখী বসিয়া আছে—প্রেমলাপ করিতেছে না, কলহ করিতেছে না—কেবল নিঃশব্দে উভয়ের চক্ষু বাহিয়া অশ্রু বহিয়া যাইতেছে।

নিজ্ঞেদের জীবনের এই একান্ত করুণ চিত্রটি তাহার মনশ্চক্ষের অগোচর ছিল বলিয়াই ইতিমধ্যে গৃহে তাহার অনেক উৎসব-রঙ্গমণীর নিষ্ফল অভিনয় হইয়া গেল—পরাজয়ের লজ্জা তাহাকে ধূলির সঙ্গে মিশাইয়া দিল না!

কিন্তু আজিকার দিনটা ঠিক তেমন করিয়া কাটিতে চাহিল না।
কেন, সেই কথাটাই বলিব।

জন্মতিথি উপলক্ষে প্রতি বৎসর তাহার গৃহে একটা আমোদ-আহ্লাদ
ও খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠান হইত। আজ সেই আয়োজনটাই কিছু
অতিরিক্ত আড্ডারের সহিত হইতেছিল। বাটীর দাস-দাসী হইতে
আরম্ভ করিয়া প্রতিবেশীরা পর্য্যন্ত আসিয়া যোগ দিয়াছে। কেবল তাহার
নিজেরই যেন কিছুতে গা নাই। সকাল হইতে আজ তাহার মনে হইতে
লাগিল, সমস্ত বৃথা, সমস্ত পণ্ড্রম। কেমন করিয়া যেন এত দিন তাহার
মনে হইতেছিল, ওই লোকটা ও দুনিয়ার অপবসকলেবই মত, সেও মানুষ—
সেও জীবের অতীত নয়। তাহার গৃহের এই যে সব আনন্দ-উৎসবের
অপর্য্যাপ্ত ও নব নব আয়োজন, ইহার বার্তা কি তাহার রুদ্ধ বাতায়ন ভেদিয়া
সেই নিভৃত কক্ষে গিয়া পশে না? তাহার কাজের মধ্যে কি বাধা দেয় না?

হয় ত বা সে তাহার তুলিটা ফেলিয়া দিয়া কখনও স্থিব হইয়া বসে,
কখনও বা অস্থির ক্রতপদে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, কখনও বা
নিদ্রাবিহীন তপ্তশয্যায় পড়িয়া সারারাত্রি জলিয়া পুড়িয়া মবে, কখনও
বা—কিন্তু থাক্ সে সব।

কল্লনার এতদিন মা-শোয়ে একপ্রকার তীক্ষ্ণ আনন্দ অনুভব
করিতেছিল, কিন্তু আজ তাহার হঠাৎ মনে হইতেছিল কিছুই না—কিছুই
না। তাহার কোন কাজেই তাহার কোন বিঘ্ন ঘটায় না। সমস্ত
মিথ্যা, সমস্ত ঝাঁকি। সে ধরিতেও চাহে না—ধরা দিতেও চাহে না।
ওই কেমন দুর্বল দেহটা অকস্মাৎ কি করিয়া যেন একেবারে পাহাড়ের
মত কঠিন ও অচল হইয়া গিয়াছে—কোথাকার কোন ঝঙ্কাই আর
তাহাকে একবিন্দু বিচলিত করিতে পারে না।

কিন্তু তথাপি জন্মতিথি উৎসবের বিরাট আয়োজন আড়ম্বরের সঙ্গেই চলিতেছিল। পো-খিন আজ সর্বত্র, সকল কাজে। এমন কি, পরিচিতদের মধ্যে একটা কাণা-দুয়া চলিতেছিল যে, এক দিন এই লোকটাই এ বাড়ীর কর্তা হইয়া উঠিবে—এবং বোধ হয়, সে দিন বড় বেশি দূরেও নয়।

গ্রামের নরনারীতে বাড়ি পবিত্র হইয়া গিয়াছে—চারিদিকেই আনন্দ কলরব। শুধু যাহার জন্ম এই সব সেই মানুষটিই বিমনা—তাহারই মুখ নিরানন্দের ছায়ায় আচ্ছন্ন। কিন্তু এই ছায়া বাহিরের কাহারো প্রায় চোখে পড়ে না—পড়িল কেবল বাটীর দুই-এক জন সাবেক দিনের দাস-দাসীর। আর পড়িল বোধ হয় তাঁহার—যিনি অলক্ষ্যে থাকিয়াও সমস্ত দেখেন। কেবল তিনিই দেখিতে লাগিলেন, ওই মেয়েটির কাছে আজ সমস্তই শুধু বিড়ম্বনা। এই জন্মতিথির দিনে প্রতিবৎসর যে লোকটি সকলের আগে গোপনে তাহার গলায় আশীর্বাদের মালা পরাইয়া দিত, আজ সে লোক নাই, সে মালা নাই, সে আশীর্বাদের আজ একান্ত অভাব।

মা-শোয়ের পিতার আমলের বৃদ্ধ আসিয়া কহিল, ছোটমা, কই তাহাকে ত দেখি না ?

বুড়া কিছুকাল পূর্বের কন্ধে অবসর লইয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহার ঘরও অল্প গ্রামে—এই মনান্তরের খবর সে জানিত না। আজ আসিয়া চাকর-মহলে শুনিয়াছে। মা-শোয়ে উদ্ধতভাবে বলিল, দেখিবার দরকার থাকে, তাহার বাড়ি যাও—আমার এখানে কেন ?

বেশ, তাই যাইতেছি, বলিয়া বৃদ্ধ চলিয়া গেল। মনে মনে বলিয়া গেল, কেবল তাঁহাকে একাকী দেখিলেই ত চলিবে না—তোমাদের

ছুইজনকেই আমার একসঙ্গে দেখা চাই। নইলে এতটা পথ বৃথাই হাঁটিয়া আসিয়াছি।

কিন্তু বুড়ার মনের কথাটি এই নবীনার অগোচর রহিল না। সেই অবধি এক প্রকার সচকিত অবস্থাতেই তাহার সকল কাজের মধ্যে সময় কাটিতেছিল, সহসা একটা চাপা গলাব অশ্রুট শব্দে চাহিয়া দেখিল—
বা-খিন। তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া বিদ্যুৎ বহিয়া গেল, কিন্তু চক্ষের নিমেষে আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া সে মুখ ফিরাইয়া অগ্রভ্রম চলিয়া গেল।

খানিক পরে বুড়া আসিয়া কহিল, ছোটমা, যাহাই হোক, তোমার অতিথি! একটা কথাও কি কহিতে নাই?

কিন্তু তোমাকে ত আমি ডাকিয়া আনিতে বলি নাই?

সেইটাই আমার অপরাধ হইয়া গিয়াছে, বলিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, মা-শোয়ে ডাকিয়া কহিল, বেশ ত, আমি ছাড়া আবও ত লোক আছে, তাঁহারা কথা বলিতে পারেন!

বুড়া বলিল, তা পারেন, কিন্তু আর আবশ্যক নাই, তিনি চলিয়া গিয়াছেন।

মা-শোয়ে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। তার পরে কহিল, আমার কপাল। নইলে তুমিও ত তাঁহাকে খাইয়া যাইবার কথাটা বলিতে পারিতে!

না, আমি এত নির্লজ্জ নই, বলিয়া বুড়া রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

এই অপমানে বা-খিনের চোখে জল আসিল। কিন্তু সে কাহাকেও দোষ দিল না, কেবল আপনাকে বাবংবার বিক্রার দিয়া কহিল, এ ঠিকই হইয়াছে। আমার মত লজ্জাহীনের ইহারই প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু প্রয়োজন যে ঐখানেই—ঐ একটা রাত্রির ভিতর দিয়াই শেষ হয় নাই, ইহার চেয়ে অনেক—অনেক বেশি অপমান যে তাহার অদৃষ্টে ছিল, ইহা দিন-ডুই পবে টেব পাইল, আর এমন করিয়া টের পাইল যে, সে লজ্জা সারাজীবনে কোথায় বাধিবে, তাহাব কূল-কিনারা দেখিল না।

যে ছবিটাব কথা লইয়া এই আখ্যানিকা আরম্ভ হইয়াছে, জাতকের সেই গোপার চিত্রটা এত দিনে সম্পূর্ণ হইয়াছে, একমাসের অধিক কাল অবিশ্রাম পরিশ্রমের ফল আজ শেষ হইয়াছে। সমস্ত সকালটা সে এই আনন্দেই মগ্ন হইয়া রহিল।

ছবি রাজদববাবে যাইবে, বিনি দাম দিয়া লইয়া যাইবেন, সংবাদ পাইয়া তিনি উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ছবির আবরণ উন্মুক্ত হইলে তিনি চমকিয়া গেলেন। চিত্র সম্বন্ধে তিনি আনাড়ী ছিলেন না, অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে ক্ষুদ্র-স্বরে বলিলেন, এ ছবি আমি রাজাকে দিতে পারিব না।

বা-খিন ভয়ে বিষ্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, কেন ?

তার কারণ এ মুখ আমি চিনি। মানুষের চেহারা দিয়া দেবতা গড়িলে দেবতাকে অপমান করা হয়। এ কথা ধরা পড়িলে রাজা আমার মুখ দেখিবেন না। এই বলিয়া সে চিত্রকরের বিস্ফারিত ব্যাংকুল চক্ষের

প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, একটু মন দিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবেন—এ কে। এ ছবি চলিবে না।

বা-খিনের চোখের উপর হইতে ধীরে ধীরে একটা কুয়াসার ঘোর কাটিয়া যাইতেছিল। ভদ্রলোক চলিয়া গেলেও সে তেমনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, আর তাহার বুঝিতে বাকি নাই, এতদিন এই প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া সে হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে যে সৌন্দর্য্য যে মাধুর্য্য বাহিরে টানিয়া আনিয়াছে, দেবতার রূপে যে তাহাকে অহনিশা ছলনা করিয়াছে—সে জাতকের গোপা নহে, সে তাহারই মা-শোয়ে।

চোখ মুছিয়া মনে মনে কহিল, ভগবান! আমাকে এমন করিয়া বিড়ম্বিত করিলে—তোমার আমি কি করিয়াছিলাম।

৯

পো-খিন সাহস পাইয়া বলিল, তোমাকে দেবতাও কামনা করেন, মা-শোয়ে, আমি ত মাছুষ।

মা-শোয়ে অশ্রুমনস্কের মত উত্তর দিল, কিন্তু যে করে না, সে বোধ হয় তবে দেবতারও বড়।

কিন্তু এ প্রসঙ্গকে সে আর অগ্রসর হইতে দিল না, কহিল, শুনিয়াছি, দরবারে আপনার যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে—আমার একটা কাজ করাইয়া দিতে পারেন? খুব শীঘ্র?

পো-খিন উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি?

একজনকে কাছে আমি অনেক টাকা পাই, কিন্তু আদায় করিতে পারি না। কোন দলীল নাই! আপনি কিছু উপায় করিতে পারেন?

পারি। কিন্তু তুমি কি জানো না, এই রাজকর্মচারীটি কে? বলিয়া লোকটা হাসিল।

এই হাসির মধ্যেই স্পষ্ট উত্তর ছিল। মা-শোয়ে ব্যগ্র হইয়া তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, তবে দিন একটি উপায় করিয়া। আজই। আমি একটা দিনও আর বিলম্ব করিতে চাহি না।

পো-খিন খাড় নাড়িয়া কহিল, বেশ, তাই।

এই ঋণটা চিরদিন এত তুচ্ছ, এত অসম্ভব, এতই হাসির কথা ছিল যে, এ সম্বন্ধে কেহ কখনো চিন্তা পর্য্যন্ত করে নাই। কিন্তু রাজকর্মচারীর মূখের আশায় মা-শোয়ের সমস্ত দেহ এক মুহূর্তের উত্তেজনায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিল; সে দুই চক্ষু প্রদীপ্ত করিয়া সমস্ত ইতিহাস বিবৃত করিয়া কহিতে লাগিল, আমি কিছুই ছাড়িয়া দিব না—একটা কড়ি পর্য্যন্ত না। জেঁক ধেমল করিয়া রক্ত শুষিয়া লয়, ঠিক তেমনি করিয়া। আজই—এখনই হয় না?

এ বিষয়ে এই লোকটাকে অধিক বলা বাহুল্য। ইহা তাহার আশার অতীত! সে ভিতরের আনন্দ ও আগ্রহ কোনমতে সংবরণ করিয়া বলিল, রাজার আইন অন্ততঃ সাত দিনের সময় চায়। এ সময়টুকু কোনরূপে ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতেই হইবে। তাহার পরে ধেমল করিয়া খুশী, যত খুশী রক্ত শুষিবে, আমি আপত্তি করিব না।

সেই ভাল। কিন্তু এখন আপনি যান। এই বলিয়া সে একপ্রকার যেন ছুটিয়া পলাইল।

এই ছকোব মেয়েটির প্রতি লোকটির লোভের অবধি ছিল না। তাই অনেক অবহেলা সে নিঃশব্দে পরিপাক করিত, আজিও করিল। বরঞ্চ গৃহে ফিরিবার পথে আজ তাহার পুলকিত চিত্ত পুনঃ পুনঃ এই

কথাটাই আপনাকে আপনি কহিতে লাগিল, আর ভয় নাই—তাহার সফলতার পথ নিষ্কণ্টক হইতে আর বোধ হয় অধিক বিলম্ব হইবে না। সে কথা সত্য। কিন্তু কত শীঘ্র এবং কত বড় বিস্ময় যে ভগবান তাহার অদৃষ্টে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, এ আজ কল্পনা করাও তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

১০

ঋণের দাবীর চিঠি আসিল। কাগজখানা হাতে করিয়া বা-থিন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ঠিক এই জিনিসটি সে আশা করে নাই বটে, কিন্তু আশ্চর্য্যও হইল না। সময় অল্প, শীঘ্র কিছু একটা করা চাই।

এক দিন নাকি মা-শোয়ে রাগেব উপর তাহার পিতার অপব্যয়ের প্রতি বিদ্রূপ করিয়াছিল, তাহার এ অপরাধ সে বিশ্বৃতও হয় নাই, ক্ষমাও করে নাই। তাই সে সময়ভিক্ষার নাম করিয়া আর তাঁহাকে অপমান করিবার কল্পনাও করিল না। শুধু চিন্তা এই যে, তাহার যাহা কিছু আছে, সব দিয়াও পিতাকে ঋণমুক্ত করা যাইবে কি না। গ্রামের মধ্যেই এক জন ধনী মহাজন ছিল। পরদিন সকালেই সে তাহার কাছে গিয়া গোপনে সর্বস্ব বিক্রী করিবার প্রস্তাব করিল। দেখা গেল, যাহা তিনি দিতে চাহেন, তাহাই যথেষ্ট। টাকাটা সে সংগ্রহ করিয়া ঘরে আনিল, কিন্তু একজনের অকারণ হৃদয়হীনতা যে তাহার সমস্ত দেহ-মনের উপর অজ্ঞাতসারে কত বড় আঘাত দিয়াছিল, ইহা সে জানিল তখন, যখন জ্বরে পড়িল।

কোথা দিয়া যে দিন-রাত্রি কাটিল, তাহার খেয়াল রহিল না। জ্ঞান হইলে উঠিয়া বসিয়া দেখিল, সেই দিনই তাহার মেয়াদের শেষ দিন।

আজ শেষ দিন। আপনার নিভৃত কক্ষে বসিয়া মা-শোয়ে কল্পনার জাল বুনিতেছিল। তাহার নিজের অহঙ্কার অতুষ্ণ ঘা খাইয়া খাইয়া আর একজনের অহঙ্কারকে একেবারে অভ্রভেদী উচ্চ করিয়া দাঁড করাইয়াছিল। সেই বিবাত্ অহঙ্কার আজ তাহার পদমূলে পড়িয়া যে মাটির সঙ্গে মিশাইবে, ইহাতে তাহার লেশমাত্র সংশয় ছিল না।

এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া জানাইল, নিচে বা-খিন অপেক্ষা করিতেছে। মা-শোয়ে মনে মনে ক্রুর হাসি হাসিয়া বলিল, জানি। সে নিজেও ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল।

মা-শোয়ে নিচে আসিতেই বা-খিন উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মা-শোয়ের বকে শেল বিঁবিল। টাকা সে চাহে না, টাকার প্রতি লোভ তাহার কাণাকড়ির নাই, কিন্তু সেই টাকার নাম দিয়া কত ভয়ঙ্কর অত্যাচার যে অহুষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা সে আজ এই দেখিল। বা-খিন প্রথমে কথা কহিল, বলিল, আজ সাত দিনের শেষ দিন, তোমার টাকা আনিয়াছি।

হায় রে, মানুষ মরিতে বসিয়াও দর্প ছাড়িতে চায় না। নইলে প্রত্যুত্তরে এমন কথা মা-শোয়ের মুখ দিয়া কেমন করিয়া বাহির হইতে পারিল যে, সে সামান্য কিছু টাকা প্রার্থনা করে নাই—ঋণের সমস্ত টাকা পরিশোধ করিতে বলিয়াছে।

বা-খিনের পীড়িত, শুষ্ক-মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল, বলিল, তাই বটে, তোমার সমস্ত টাকাই আনিয়াছি।

সমস্ত টাকা? পাইলে কোথায়?

কালই জানিতে পারিবে। ওই বাস্‌টায় টাকা আছে, কাহাকেও গণিয়া লইতে বল।

গাড়োয়ান দ্বারপ্রান্ত হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আর কত বিলম্ব হইবে? বেলা থাকিতে বাহির হইতে না পারিলে যে পেণ্ডতে রাত্রের মত আশ্রয় নিলিবে না!

মা-শোয়ে গলা বাড়াইয়া দেখিল, পথের উপর বাস্‌ট বিছানা প্রভৃতি বোঝাই দেওয়া গো-যান দাঁড়াইয়া। ভয়ে চক্ষের নিমেষে তাহার নমস্ত মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, ব্যাকুল হইয়া একেবারে মহত্ প্রহ্ন করিতে লাগিল, পেণ্ডতে কে যাইবে? গাড়ী কাহার? কোথায় এত টাকা পাইলে? চূপ করিয়া আছ কেন? তোমার চোখ অত শুকুনো কিসের জন্ত? কাল কি জানিব? আজ বলিতে তোমার—

বলিতে বলিতেই সে আত্মবিস্মৃত হইয়া কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিল—এবং নিমেষে হাত ছাড়িয়া দিয়া তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া চমকিয়া উঠিল—উঃ—এ যে জ্বর, তাই ত বলি, মুখ অত ফ্যাকাসে কেন?

বা-খিন আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া শাস্ত মূর্ছ কঠে কহিল, ব'স। বলিয়া সে নিজেই বসিয়া পড়িয়া কহিল, আমি মান্দালে যাত্রা করিয়াছি। আজ তুমি আমার একটা শেষ অনুরোধ শুনিবে?

মা-শোয়ে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে শুনিবে। বা খিন একটু স্থির থাকিয়া কহিল, আমার শেষ অনুরোধ, সৎ রেখিয়া কাহাকেও স্বীয় বিবাহ করিও। এমন অবিবাহিত অবস্থায় আর বেশি দিন থাকিও না। আর একটা কথা—

এই বলিয়া সে আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া এবার আরও মূঢ়কণ্ঠে বলিতে লাগিল, আর একটা জিনিষ তোমাকে চিরকাল মনে রাখিতে

বলি। এই কথাটা কখনও ভুলিবে না যে, লজ্জার মত অভিমানও দ্বীলোকের ভূষণ বটে, কিন্তু বাড়াবাড়ি করিলে—

মা-শোয়ে অধীর হইয়া মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, ও-সব আর একদিন শুনিব। টাকা পাইলে কোথায়?

বা-থিন হাসিল। কহিল, এ কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? আমার কি না তুমি জানো?

টাকা পাইলে কোথায়?

বা-থিন ঢোক গিলিয়া ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে কহিল, বাবার ঋণ তাঁর সম্পত্তি দিয়াই শোধ হইয়াছে—নইলে আমার নিজের আর আছে কি?

তোমার ফুলের বাগান?

সে-ও ত বাবার।

তোমার অত বই?

বই লইয়া আর করিব কি? তা ছাড়া সে-ও ত তাঁরই।

মা-শোয়ে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যাক ভালই হইয়াছে। এখন উপরে গিয়া শুইয়া পড়িবে চল।

কিন্তু আজ যে আমাকে বাইতেই হইবে।

এই জর লইয়া? এ কি তুমি সত্যি বিশ্বাস কর, তোমাকে আমি এই অবস্থায় ছাড়িয়া দিব? এই বলিয়া সে কাছে অশিস্যা আবার তাহার হাত ধরিল। এবার বা-থিন বিষয়ে চাহিয়া দেখিল, মা-শোয়ের মুখের চেহারা এক মুহূর্তেই একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। সে মুখে বিবাদ, বিদ্বেষ, নিরাশা, লজ্জা, অভিমান কিছুই চিহ্নমাত্র নাই। আছে শুধু বিরাত স্নেহ ও তেমনি বিপুল শক্তি। এই মুখ তাহাকে একেবারে

ছবি

২৮

মস্তমুগ্ধ করিয়া দিল, সে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে তাহার পিছনে পিছনে উপরে শয়ন কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহাকে শয্যায় শোয়াইয়া দিয়া মা-শোয়ে কাছে বসিল, দুটি সজল দৃষ্ট চক্ষু তাহার পাণ্ডুর মুখের উপর নিবন্ধ করিয়া কহিল, তুমি মনে কর, কতকগুলো টাকা আনিয়াছ বলিয়াই আমার ঋণ শোধ হইয়া গেল ? মান্দালের কথা ছাড়িয়া দাও, আমার হুকুম ছাড়া এই ঘরের বাহিরে গেলেও আমি ছাদ হইতে নিচে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিব। আমাকে অনেক দুঃখ দিয়াছ, কিন্তু আর দুঃখ কিছুতে সহিব না, এ তোমাকে আমি নিশ্চয়ই বলিয়া দিলাম।

বা-ধিন আর জবাব দিল না। গায়ের কাপড়টা টানিয়া লইয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিলাসী*

পাকা দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে বিছা অর্জন করিতে যাই। আমি একদিন—দশ-বারো জন। বাহাদেরই বাটা পল্লীগ্রামে, তাহাদেরই ছেলেদের শতকরা আশি জনকে এমনি করিয়া বিছালাভ করিতে হয়। ইহাতে লাভের অঙ্কে শেষ পর্যন্ত একেবারে শূন্য না পড়িলেও, বাহা পড়ে, তাহাতে হিসাব করিবার পক্ষে এই কয়টা কথা চিন্তা করিয়া দেখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে ছেলেদের সকাল আটটার মধ্যে বাহির হইয়া বাতারাতে চার ক্রোশ পথ ভাঙিতে হয়—চার ক্রোশ মানে আট মাইল নয়, তের বেশি—বর্ষার দিনে মাথার উপর মেঘেব জল ও পায়ের নিচে এক হাঁটু কাদা এবং গ্রীষ্মেব দিনে জলের বদলে কড়া সূর্য্য এবং কাদার বদলে ধূলার সাগর সাঁতার দিয়া স্কুল ঘর করিতে হয়, সেই দুর্ভাগা বালকদের মা-সরস্বতী খুসী হইয়া বর দিবেন কি, তাহাদের যত্না দেখিয়া কোথায় যে তিনি মুখ লুকাইবেন, ভাবিয়া পান না।

তাব পরে এই কৃতবিদ্য শিশুর দল বড় হইয়া একদিন গ্রামেই বসুন, আর ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া যান—তাদের চার ক্রোশ-হাঁটা বিছার তেজ আত্মপ্রকাশ করিবেই করিবে। কেহ কেহ বলেন গুনিয়াছি, আচ্ছা যাদের ক্ষুধার জ্বালা, তাদের কথা না হয় নাই ধরিলাম, কিন্তু যাদের সে

* জনৈক পল্লীবাগকের ডায়েরী হইতে নকল। তার আসল নামটা কাহারও জানিবার প্রয়োজন নাই, নিবেদন আছে। ডাকনামটা না হয় ধরুন স্কাডা।

জালা নাই, তেমন সব ভদ্রলোকেই বা কি স্থখে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করেন? তাঁরা বাস করিতে থাকিলে ত পল্লীর এত দুর্দশা হয় না!

ম্যালেরিয়ার কথাটা না হয় নাই পাড়িলাম। সে থাক্, কিন্তু ঐ চার ক্রোশ-ইটার জালার কত ভদ্রলোকেই যে ছেলে-পুলে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া সহরে পালান, তাহার আর সংখ্যা নাই। তার পরে একদিন ছেলে-পুলের পড়াও শেষ হয় বটে, তখন কিন্তু সহরের স্থখ-সুবিধা রুচি লইয়া আর তাঁদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না।

কিন্তু থাক্ এ সকল বাজে কথা। ইহুলে যাই—দুক্রোশের মধ্যে এমন আরও ত দু-তিনখানা গ্রাম পার হইতে হয়। কার বাগানে আম পাকিতে শুরু করিয়াছে, কোন্ বনে বঁটচি ফল অপূর্ণাঙ্গ ফলিয়াছে, কার গাছে কাঁটাল এই পাকিল বলিয়া, কার মর্তমান রন্তার কাঁদি কাটিয়া লইবার অপেক্ষা মাত্র, কার কানাচে বোপের মধ্যে আনারসের গায়ে রঙ ধরিয়াছে, কার গুহুর-পাড়ের খেজুর-মেতি কাটিয়া খাইলে ধবা পড়িবার সম্ভাবনা অল্প, এই সব খবর লইতেই সময় যায়, কিন্তু আসল যা বিত্তা—কামকট্কার রাজধানীর নাম কি, এবং সাইবিরিয়ার খনির মধ্যে রূপা মেলে না সোনা মেলে—এ সকল দরকারী তথ্য অবগত হইবার ফুরসৎই মেলে না।

কাজেই একজামিনের সময় এডেন কি জিজ্ঞাসা করিলে বলি পারসিয়ার বন্দর, আর হুমায়ূনের বাপের নাম জানিতে চাহিলে লিখিয়া দিয়া আসি তোগ্লক খাঁ—এবং আজ চল্লিশের কোঠা পার হইয়াও দেখি, ও-সকল বিষয়ের ধারণা প্রায় এক রকমই আছে—তার পরে প্রমোশনের দিন মুখ ভার করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া কখনো বা দল বাঁধিয়া মতলব করি

মাষ্টারকে ঠাণ্ডানো উচিত, কখনো বা ঠিক করি, অমন বিদ্রী ক্ষুদ্র ছাড়িয়া দেওয়াই কর্তব্য।

আমাদের গ্রামে একটি ছেলের সঙ্গে মাঝে মাঝে স্কুলের পথে দেখা হইত। তার নাম ছিল মৃত্যুঞ্জয়। আম দেব চেয়ে সে অনেক বড়। খার্ড ক্লাশে পড়িত। কবে যে সে প্রথম খার্ড ক্লাশে উঠিয়াছিল, এ খবর আমরা কেহই জানিতাম না—সম্ভবতঃ তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়—আমরা কিন্তু তাহার ঐ খার্ড ক্লাসটাই চিরদিন দেখিয়া আসিয়াছি। তাহার ফোর্থ ক্লাসে পড়ার ইতিহাসও বখনো শুনি নাই, সেকেও ক্লাসে উঠিবার খবরও কখনো পাঠি নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের বাপ মা ভাই-বোন কেহই ছিল না, ছিল শুধু গ্রামের এক প্রান্তে একটা প্রকাণ্ড আম-কাঁটালের বাগান আর তাব মঝে একটা প্রকাণ্ড পোড়ো বাড়ি, আর ছিল এক জ্ঞাতি খুড়া। খুড়ার কাজ হিন ভাই.পার নানাবিধ দুর্নাম রটনা করা—সে গাঁজা খায়, সে গুলি খায়, এম্নি আরও কত কি। তাঁর আর একটা কাজ ছিল বলিয়া বেড়ানো, ঐ বাগানের অর্ধেকটা তাঁর নিজের অংশ, নালিশ করিয়া দখল করার অপেক্ষা মায়। অবশ্য দখল এক দিন তিনি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে জেলা-আদালতে নালিশ করিয়া নয়—উপরের আদালতের হুকুমে। কিন্তু সে কথা পরে হইবে।

মৃত্যুঞ্জয় নিজে রান্না করিয়া খাইত এবং আমের দিনে ঐ আম-বাগানটা জমা দিয়াই তাহার সারা বৎসরের খাওয়া-পরা চলিত, এবং ভাল করিয়াই চলিত। যে দিন দেখা হইয়াছে, সেই দিনই দেখিয়াছি ছেঁড়া-খোঁড়া মলিন বইগুলি বগলে করিয়া পথের ধার দিয়া নীরবে চলিয়াছে। তাহাকে কখনো বাহারও সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে দেখি নাই—বরঞ্চ উপযাচক হইয়া কথা কহিতাম আমরাই। তাহার

প্রধান কারণ ছিল এই যে, দোকানের খাবার কিনিয়া খাওয়াইতে গ্রামের মধ্যে তাহার জোড়া ছিল না। আর শুধু ছেলেরাই নয়। কত ছেলের বাপ কতবার যে গোপনে ছেলেকে দিয়া তাহার কাছে স্কুলের মাহিনা হারাইয়া গেছে, বই চুরি গেছে, ইত্যাদি বলিয়া টাকা আদায় কবিয়া লইত, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ঋণ স্বীকার করা ত দুর্ব্ব কথ্য, ছেলে তাহার সহিত একটা কথা কহিয়াছে এ কথাও কোন বাপ ভদ্র-সমাজে কবুল করিতে চাহিত না—গ্রামের মধ্যে মুতাজ্জয়ের ছিল এমনি সুনাম।

অনেক দিন মুতাজ্জয়ের দেখা নাই। এক দিন শোনা গেল সে মর মর। আর একদিন শোনা গেল, মালপাডাব এক বৃদ্ধ মাল তাহার চিকিৎসা করিয়া এবং তাহার মেয়ে বিলাসী সেবা কবিয়া মুতাজ্জয়কে যমের মুখ হইতে এ বাজা ফিরাইয়া আনিয়াছে।

অনেক দিন তাহার অনেক মিষ্টান্নের সন্ধ্যা করিয়াছি—মনটা কেমন করিতে লাগিল, এক দিন সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া তাহাকে দেখিতে গেলাম। তাহার পোডো-বাড়ীতে প্রাচীরের বালাই নাই। স্বচ্ছন্দে ভিতরে ঢুকিয়া দেখি, ঘরের দরজা খোলা, বেশ উজ্জ্বল একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর ঠিক সন্মুখেই তত্তাপোষের উপব পরিষ্কার ধপ্পে বিছানায় মুতাজ্জয় শুইয়া আছে, তাহার কঙ্কালসার দেহের প্রতি চাহিলেই বুঝা যায় বাস্তবিকই যমরাজ চেষ্টার ক্রটি কিছু করেন নাই, তবে যে শেষ পর্যন্ত সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, সে কেবল ওই মেয়েটির জোরে। সে শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছিল, অকস্মাৎ মাছুষ দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এই সেই বৃদ্ধ সাপুড়ের মেয়ে বিলাসী। তাহার বয়স আঠারো কি আটাশ ঠাহর করিতে পারিলাম

না। কিন্তু মুখের প্রতি চাহিবামাত্রই টের পাইলাম, বয়স যাই হোক, খাটিয়া খাটিয়া আর রাত জাগিয়া জাগিয়া ইহার শরীরে আর কিছু নাই। ঠিক যেন ফুলদানীতে জল দিয়া ভিজাইয়া-রাখা বাসি ফুলের মত! হাত দিয়া এতটুকু স্পর্শ করিলে, এতটুকু নাড়াচাড়া করিতে গেলেই ঝরিয়া পড়িবে!

মৃত্যুঞ্জয় আমাকে চিনিতে পারিয়া বলিল, কে, খ্যাড়া?

বলিলাম, হুঁ।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, ব'সো।

মেয়েটা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃত্যুঞ্জয় দুই-চারিটা কথা যাহা কহিল, তাহার মর্ম্ম এই যে, প্রায় দেড়মাস হইতে চলিল সে শয্যাগত। মধ্যে দশ-পনেরো দিন সে অজ্ঞান অচেতন অবস্থায় পড়িয়া ছিল, এই কয়েক দিন হইল সে লোক চিনিতে পারিতেছে এবং যদিচ এখনো সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু আর ভয় নাই।

ভয় নাই থাকুক। কিন্তু ছেলেমানুষ হইলেও এটা বুঝিলাম, আজও যাহার শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবার ক্ষমতা হয় নাই, সেই রোগীকে, এই বনের মধ্যে একাকী যে মেয়েটা বাঁচাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছিল, সে কত বড় গুরুভার! দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি তাহার কত সেবা, কত শুশ্রূষা, কত দৈর্ঘ্য, কত রাত-জাগা! সে কত বড় সাহসের কাজ! কিন্তু যে বস্তুটি এই অসাধ্য সাধন করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার পরিচয় যদিচ সে দিন পাই নাই, কিন্তু আর এক দিন পাইয়াছিলাম।

ফিরিবার সময় যেয়েটি আর একটি প্রদীপ লইয়া আমার আগে আগে ভাঙা প্রাচীরের শেষ পর্য্যন্ত আসিল। এতকণ পর্য্যন্ত সে একটি

কথাও কহে নাই, এইবার আস্তে আস্তে বলিল, রাস্তা পর্য্যন্ত তোমার, রেখে আসব কি ?

বড় বড় আমগাছে সমস্ত বাগানটা যেন একটা জমাট অন্ধকারের মত বোধ হইতেছিল, পথ দেখা ত দূরের কথা, নিজের হাতটা পর্য্যন্ত দেখা যায় না। বলিলাম, পৌছে দিতে হবে না, শুধু আলোটা দাও।

সে প্রদীপটা আমার হাতে দিতেই তাহার উৎকণ্ঠিত মুখের চেহারাটা আমার চোখে পড়িল। আস্তে আস্তে সে বলিল, একলা যেতে ভয় করবে না ত ? একটু এগিয়ে দিয়ে আসব ?

মেয়েমাছুষ জিজ্ঞাসা করে, ভয় করবে না ত ! স্তবরাং মনে যাই থাক, প্রত্যন্তরে শুধু একটা না বলিয়াই অগ্রসর হইয়া গেলাম।

সে পুনরায় কহিল, ঘন-জঙ্গলের পথ, একটু দেখে দেখে পা ফেলে যেয়ো।

সর্বাক্ষেপ কাটা দিয়া উঠিল, কিন্তু এতক্ষণে বুঝিলাম উদ্বেগটা তাহার কিসের জন্ত এবং কেন সে আলো দেখাইয়া এই বনের পথটা পার করিয়া দিতে চাহিতেছিল ! হয় ত সে নিষেধ শুনিত না, সজেই যাইত, কিন্তু পীড়িত মৃত্যুঞ্জয়কে একাকী ফেলিয়া যাইতেই বোধ করি তাহার শেষ পর্য্যন্ত মন সরিল না।

ঝুড়ি-পঁচিশ বিঘার বাগান। স্তবরাং পথটা কম নয়। এই দারুণ অন্ধকারের মধ্যে প্রত্যেক পদক্ষেপই বোধ করি ভয়ে ভয়ে করিতে হইত, কিন্তু পরক্ষণেই মেয়েটির কথাতেই সমস্ত মন এমনি আচ্ছন্ন হইয়া রহিল যে, ভয় পাইবার আর সময় পাইলাম না। কেবল মনে হইতে লাগিল, একটা মৃত-কল্প রোগী লইয়া থাকা কত কঠিন ! মৃত্যুঞ্জয় ত যে কোন

মুহুর্তেই মরিতে পারিত, তখন সমস্ত রাত্রি এই বনের মধ্যে মেঘেটি একাকী কি করিত ! কেমন করিয়া তাহার সে রাতটা কাটিত !

এই প্রশ্নের অনেক দিন পরের একটা কথা আমার মনে পড়ে । এক আত্মীরের মৃত্যুকালে আমি উপস্থিত ছিলাম । অন্ধকার রাত্রি—বাটীতে ছেলে-পুলে চাকর-বাকর নাই, ঘরের মধ্যে শুধু তাঁর সন্ত-বিধবা-স্ত্রী, আর আমি । তাঁর স্ত্রী ত শোকের আবেগে দাপা দাপি করিয়া এমন কাণ্ড করিয়া তুলিলেন যে, ভয় হইল তাঁহারও প্রাণটা বুঝি বাহির হইয়া যায় বা । কাঁদিয়া কাঁদিয়া বার বার আমাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তিনি স্বেচ্ছায় যখন সহমরণে যাইতে চাহিতেছেন, তখন সরকারের কি ? তাঁর যে আর তিলান্না বাচিতে সাধ নাই, এ কি তাহারা বুঝিবে না ? তাহাদের ঘরে কি স্ত্রী নাই ? তাহারা কি পাষণ ? আর এই রাত্রেই গ্রামের পাঁচজনে যদি নদীর তীরের কোন একটা জঙ্গলের মধ্যে তাঁর সহমরণের যোগাড় করিয়া দেয় ত পুলিশের লোক জানিবে কি করিয়া ? এমন কত কি ! কিন্তু আমার ত আর বসিয়া বসিয়া তাঁর কান্না শুনিতেই চলে না ! পাড়ায় খবর দেওয়া চাই—অনেক জিনিস যোগাড় করা চাই । কিন্তু আমার বাহিরে যাইবার প্রস্তাব শুনিয়াই তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন । চোখ মুছিয়া বলিলেন, ভাই, যা হবার সে ত হয়েছে, আর বাইরে গিয়ে কি হবে ? রাতটা কাটুক না ।

বলিলাম, অনেক কাজ, না গেলেই যে নয় ।

তিনি বলিলেন, হোক্ কাজ, তুমি ব'সো ।

বলিলাম, বসলে চলবে না, একবার খবর দিতেই হবে, বলিয়া পা বাড়াইবামাত্রই তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ওরে বাপ রে ! আমি একলা থাকতে পারব না ।

কাজেই আবার বসিয়া পড়িতে হইল। কারণ তখন বুঝিলাম, যে-স্বামী জ্যাস্ত থাকিতে তিনি নির্ভয়ে পঁচিশ বৎসর একাকী ঘর করিয়াছেন, তাঁর মৃত্যুটা যদি বা সহ্যে, তাঁর মৃত দেহটা এই অন্ধকার রাত্রে পাঁচ মিনিটের জন্তও সহিবে না !

বুক যদি কিছুতে ফাটে ত সে এই মৃত স্বামীর কাছে একলা থাকিলে।

কিন্তু দুঃখটা তাঁহার তুচ্ছ করিয়া দেখানও আমার উদ্দেশ্য নহে। কিংবা তাহা খাটি নয় এ কথা বলাও আমার অভিপ্রায় নহে। কিংবা একজনের ব্যবহারেই তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গেল তাহাও নহে। কিন্তু এমন আরও অনেক ঘটনা জানি, যাহার উল্লেখ না করিয়াও, আমি এই কথা বলিতে চাই যে, শুধু কর্তব্য-জ্ঞানের জোরে অথবা বহুকাল ধরিয়া একসঙ্গে ঘর করার অধিকারেই এই ভয়টাকে কোন মেয়েমানুষই অতিক্রম করিতে পারে না। ইহা আর একটা শক্তি, যাহা বহু স্বামী-স্ত্রী একশ বৎসর একত্রে ঘর-করার পরেও হয়ত তাহার কোন সন্ধান পায় না।

কিন্তু সহসা সেই শক্তির পরিচয় যখন কোন নর-নারীর কাছে পাওয়া যায়, তখন সমাজের আদালতে আসামী করিয়া তাহাদের দণ্ড দেওয়ার আবশ্যক যদি হয় ত হোক, কিন্তু মানুষের যে বস্তুটি সামাজিক নয়, সে মিছে যে ইহাদের দুঃখে গোপনে অশ্রু বিসর্জন না করিয়া কোনমতে থাকিতে পারে না।

প্রায় মাস-দুই মৃত্যুঞ্জয়ের খবর লই নাই। যাহারা পল্লীগাম দেখেন নাই, কিংবা ওই রেলগাড়ীর জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিবেন, এ কেমন কথা? এ কি কখনো সম্ভব হইতে পারে যে অন্ত-বড় অস্থখটা চোখে দেখিয়া আসিয়াও মাস-দুই আর তার খবরই নাই? তাঁহাদের অবগতির জন্ত বলা আবশ্যক যে,

এ শুধু সম্ভব নয়, এই হইয়া থাকে। একজনের বিপদে পাড়াশুদ্ধ বঁাক বাঁধিয়া উপুড় হইয়া পড়ে, এই যে একটা জনশ্রুতি আছে, জানি না তাহা সত্যযুগের পল্লীগ্রামের ছিল কি না, কিন্তু একালে ত কোথাও দেখিয়াছি, বলিয়া মনে করিতে পারি না। তবে তাহার মরার খবর যখন পাওয়া যায় নাই তখন সে যে বাঁচিয়া আছে, এ ঠিক।

এমনি সময়ে হঠাৎ এক দিন কানে গেল, মৃত্যুঞ্জয়ের সেই বাগানের অংশীদার খুড়া তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছে যে, গেল গেল, গ্রামটা এবার রসাতলে গেল। নাল্তের মিত্তির বলিয়া সমাজে আর তাঁর মুখ বাহির করিবার ঘো রহিল না—অকালকুমাণ্ডটা একটা সাপুড়ের মেয়ে নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে। আর শুধু নিকা নয়, তাও না হয় চুলায় থাক, তাহার হাতে ভাত পর্য্যন্ত খাইতেছে! গ্রামে যদি ইহার শাসন না থাকে ত বনে গিয়া বাস করিলেই ত হয়! কোড়োলা, হরিপুরের সমাজ এ কথা শুনিলে যে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তখন ছেলে-বুড়ো সকলের মুখেই ঐ এক কথা! অ্যা—এ হইল কি? কলি কি সত্যই উন্টাইতে বসিল!

খুড়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এ যে ঘটবে, তিনি অনেক আগেই জানিতেন। তিনি শুধু তামাসা দেখিতেছিলেন; কোথাকার জল কোথায় গিয়া মরে। নইলে পর নয়, প্রতিবেশী নয়, আপনার ভাইপো! তিনি কি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিতেন না? তাঁহার কি ভাস্কর-বৈজ্ঞ দেখাইবার ক্ষমতা ছিল না? তবে কেন যে করেন নাই, এখন দেখুক সবাই। কিন্তু আর ত চূপ করিয়া থাকা যায় না! এ যে মিত্তির কংশের নাম ডুবিয়া যায়! গ্রামের যে মুখ পোড়ে!

তখন আমরা গ্রামের লোক মিলিয়া যে কাজটা করিলাম, তাহা মনে

করিলে আমি আজও লজ্জায় মরিয়া যাই। খুড়া চলিলেন নালতের মিত্তির বংশের অভিভাবক হইয়া, আর আমরা দশ-বারো জন সঙ্গে চলিলাম, গ্রামের বদন দন্ধ না হয় এই জ্ঞা।

মৃত্যুঞ্জয়ের পোড়ো বাড়িতে গিয়া যখন উপস্থিত হইলাম, তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। মেয়েটি ভাড়া বারান্দার একধারে কুঠি গড়িতেছিল, অকস্মাৎ লাঠিসোঁটা হাতে এতগুলি লোককে উঠানের উপর দেখিয়া ভয়ে নীলবর্ণ হইয়া গেল।

খুড়া ঘরের মধ্যে উকি মাঝিয়া দেখিলেন, মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে। চট্ করিয়া শিকলটা টানিয়া দিয়া, সেই ভয়ে মৃতপ্রায় মেয়েটিকে সম্ভাষণ শুরু করিলেন। বলা বাহুল্য, জগতের কোন খুড়া কোন কালে বোধ করি ভাইপোর স্ত্রীকে ওরূপ সম্ভাষণ করে নাই। সে এমনি, যে মেয়েটি হীন সাপুড়ের মেয়ে হইয়াও তাহা সহিতে পারিল না; চোখ তুলিয়া বলিল, বাবা আমরা বাবুর সাথে নিকে দিয়েচে জানো।

খুড়া বলিলেন, তবে রে! ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং সঙ্গে সঙ্গেই দশ-বারো জন বীরদর্পে ছুঁকার দিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িল। কেহ ধরিল চুলের মুঠি, কেহ ধরিল কান, কেহ ধরিল হাত-ছুটো—এবং যাহাদের সে জুহুমাগ ঘটিল না, তাহারাও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল না।

কারণ সংগ্রাম-স্থলে আমরা কাপুরুষের গ্রায় চূপ করিয়া থাকিতে পারি, আমাদের বিরুদ্ধে অত বড় দুর্নাম রটনা করিতে বোধ করি নারায়ণের কর্জপক্ষেও চক্ষু লজ্জা হইবে। এইখানে একটা অবাস্তব কথা বলিয়া রাখি। শুনিয়াছি নাকি বিলাত প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ-দেশে পুরুষদের মধ্যে একটা কুসংস্কার আছে, স্ত্রীলোক দুর্বল এবং নিরুপায় বলিয়া তাহার গায়ে হাত তুলিতে নাই। এ আবার একটা কি কথা! সনাতন হিন্দু

এ কুসংস্কার মানে না। আমরা বলি, যাহারই গায়ে জোর নাই, তাহারই গায়ে হাত ভুলিতে পারা যায়! তা সে নর-নারী যাই হোক না কেন।

মেয়েটি প্রথমেই সেই যা একবার আর্ন্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল, তার পরে একেবারে চুপ করিয়া গেল। কিন্তু আমরা যখন তাহাকে গ্রামের বাহিরে রাখিয়া আসিবার জন্ত হিঁচড়াইয়া লইয়া চলিলাম, তখন সে মিনতি কবিরী বলিতে লাগিল, বাবু! আমাকে একটবার ছেড়ে দাও, আমি রুটিগুলো ঘরে দিয়ে আসি। বাইরে শিয়াল-কুকুরে খেয়ে যাবে— রোগা-মাল্লু সমস্ত রাত খেতে পাবে না।

মৃত্যুঞ্জয় রুদ্ধ ঘরের মধ্যে পাগলের মত মাথা কুটিতে লাগিল, ঘারে পদাঘাত করিতে লাগিল এবং শ্রাব্য-অশ্রাব্য বহুবিধ ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল! কিন্তু আমরা তাহাতে তিলার্দ্ধ বিচলিত হইলাম না। স্বদেশের মঙ্গলের জন্ত সমস্ত অকাতরে সহ করিয়া তাহাকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম।

চলিলাম বলিতেছি, কেন না আমিও বারবার সঙ্গে ছিলাম, কিন্তু কোথায় আমরা মধ্যে একটুখানি দুর্বলতা ছিল, আমি তাহার গায়ে হাত দিতে পারি নাই। বরঞ্চ কেমন যেন কান্না পাইতে লাগিল। সে যে অত্যন্ত অত্যাচার করিবাছে এবং তাহাকে গ্রামের বাহির করাই উচিত বটে, কিন্তু এটাই যে আমরা ভাল কাজ করিতেছি, সেও কিছুতেই মনে করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার কথা যাক্।

আপনারা মনে করিবেন না, পল্লীগ্রামে উদাবতার একান্ত অভাব। মোটেই না। বরঞ্চ বড়লোক হইলে আমরা এমন সব ঔদার্য্য প্রকাশ করি যে, শুনিলে আপনারা অবাক হইয়া যাইবেন।

এই মৃত্যুঞ্জয়টাই যদি না তাহার হাতে ভাত খাইয়া অমার্জনীয়

অপরাধ করিত, তাহা হইলে ত আমাদের এত রাগ হইত না! আর কায়েতের ছেলের সঙ্গে সাপুড়ের মেয়ের নিকা—এ ত একটা হাসিয়া উড়াইবার কথা! কিন্তু কাল করিল যে ঐ ভাত খাইয়া! হোক না সে আড়াই মাসের রুগী, হোক না সে শয্যাশায়ী! কিন্তু তাই বলিয়া ভাত! লুটি নয়, সন্দেশ নয়, পাঠার মাংস নয়! ভাত খাওয়া যে, অন্ন-পাপ! সে ত আর সত্য সত্যই মাপ করা যায় না! তা নইলে পল্লীগ্রামের লোক সন্ধীর্ণচিন্তা নয়। চার-কোশ-হাঁটা বিছা যে সব ছেলের পেটে, তারাই ত এক দিন বড় হইয়া সমাজের মাথা হয়! দেবী বীণাপাণির বরে সন্ধীর্ণতা তাহাদের মধ্যে আসিবে কি করিয়া!

“এই ত ইহারই কিছু দিন পরে, প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা পুত্রবধু মনের বৈরাগ্যে বছর-দুই কাশীবাস করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন নিম্নুকেরা কানাকানি করিতে লাগিল যে অর্ধেক সম্পত্তি ঐ বিধবার এবং পাছে তাহা বেহাত হয়, এই ভয়েই ছোটবাবু অনেক চেষ্টা অনেক পরিশ্রমের পর বোঁঠানকে সেখান হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, সেটা কাশীই বটে! যাই হোক, ছোটবাবু তাহার স্বাভাবিক ঔদার্য্যে, গ্রামের বারওয়ারী-পূজা-বাবদ দুইশত টাকা দান করিয়া, পাঁচখানা গ্রামের ব্রাহ্মণের সদক্ষিণা উত্তম ফলাহারের পর প্রত্যেক সদব্রাহ্মণের হাতে যখন একটা করিয়া কাঁসার গেলাশ দিয়া বিদায় করিলেন, তখন ধত্ত ধত্ত পড়িয়া গেল। এমন কি, পথে আসিতে অনেকেই, দেশের এবং দশের কল্যাণের নিমিত্ত, কামনা করিতে লাগিলেন, এমন সব বারা বড়লোক, তাদের বাড়িতে বাড়িতে, মাসে মাসে এমন সব সদহুষ্ঠানের আয়োজন হয় না কেন?

কিন্তু যাক। মহত্বের কাহিনী আমাদের অনেক আছে। যুগে যুগে

সম্মিত হইয়া প্রায় প্রত্যেক পল্লীবাসীর দ্বারেই শু পাকার হইয়া উঠিয়াছে। এই দক্ষিণ বঙ্গের অনেক পল্লীতে অনেক দিন ঘুরিয়া, গৌরব করিবার মত অনেক বড় বড় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। চরিত্রেই বল, ধর্ম্মেই বল, সমাজেই বল আর বিজ্ঞাতেই বল, শিক্ষা একেবারেই পুরা হইয়া আছে; এমন শুধু ইংরাজকে কসিয়া গালিগালাজ করিতে পারিলেই দেশটা উদ্ধার হইয়া যায়।

বৎসর-খানেক গত হইয়াছে। মশার কামড় আর সহ্য করিতে না পারিয়া সবেমাত্র সন্ন্যাসীগিরিতে ইস্তফা দিয়া ঘরে ফিরিয়াছি।) এক দিন ছুপুর-বেলা ক্রোশ-ছুই দূরের মাল পাড়ার ভিতর দিয়া চলিয়াছি, হঠাৎ দেখি, একটা কুটিরের দ্বারে বসিয়া মৃত্যুঞ্জয়। তার মাথায় গেরুয়া-রঙের পাগড়ী, বড় বড় দাড়ি-চুল, গলায় কক্স ও পুঁথির মালা—কে বলিবে এ আমাদের সেই মৃত্যুঞ্জয়! কায়স্থের ছেলে একটা বছরের মধ্যেই জাত দিয়া একেবারে পুরাদস্তুর সাপুড়ে হইয়া গেছে। মাহুষ কত শীঘ্র যে তাহার চৌদ্দ পুরুষের জাতটা বিসর্জন দিয়া আর একটা জাত হইয়া উঠিতে পারে, সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। ব্রাহ্মণের ছেলে মেতরাণী বিবাহ করিয়া মেতর হইয়া গেছে এবং তাহাদেব ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে, এ বোধ করি আপনারা সবাই শুনিয়াছেন। আমি সদব্রাহ্মণের ছেলেকে এন্ট্রান্স পাশ করার পরেও ডোমের মেয়ে বিবাহ করিয়া ডোম হইতে দেখিয়াছি। এখন সে ধুচুনি কুলো বুনিয়া বিক্রয় করে, শূয়ার চব্বা। ভাল কায়স্থ-সন্তানকে কসাইয়ের মেয়ে বিবাহ করিয়া কসাই হইয়া যাইতেও দেখিয়াছি। আজ সে স্বহস্তে গরু কাটিয়া বিক্রয় করে—তাহাকে দেখিয়া কাহার সাধ্য বলে, কোন কালে সে কসাই ভিন্ন আর কিছু ছিল! কিন্তু সকলেরই ওই একই হেতু। আমার তাই ত মনে-

হয়, এমন করিয়া এত সহজে পুরুষকে বাহারা টানিয়া নামাইতে পারে, তাহার্য্য কি এমনিই অবলীলাক্রমে তাহাদের ঠেলিয়া উপরে তুলিতে পারে না! যে পল্লীগ্রামের পুরুষদের স্বখ্যাতিতে আজ পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছি, গৌরবটা কি একা শুধু তাহাদেরই? শুধু নিজেদের জোরেই এত দ্রুত নিচের দিকে নামিয়া চলিয়াছে! অন্যের দিক হইতে কি এতটুকু উৎসাহ, এতটুকু সাহায্য আসে না?

কিন্তু থাক্। ঐক্যের মাথায় হয় ত বা অনধিকার চৰ্চা করিয়া ঘসিব। কিন্তু আমার মুঞ্চিল হইয়াছে এই যে, আমি কোনমতেই তুলিতে পারি না দেশের নকসুই জন নর-নারীই ঐ পল্লীগ্রামেরই মানুষ এবং সেই জন্য কিছু একটা আমাদের করা চাই-ই। যাক্। বলিতেছিলাম যে, দেখিয়া কে বলিবে এ সেই মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু আমাকে সে খাতির করিয়া দসাইল। বিলাসী পুরুষের জল আনিতে গিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া সেও ভাবি খুসি হইয়া বার বার বলিতে লাগিল, তুমি না আগ্লামে সে রাস্তিরে আমাকে তারা মেরেই ফেলত। আমার জন্তে কত মাঝি না জানি তুমি খেয়েছিলে।

কথায় কথায় শুনলাম, পরদিনই তাহার্য্য এখানে উঠিয়া আসিয়া লক্ষণঃ ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছে এবং সুখে আছে। সুখে যে আছে, এ কথা আমাকে বলার প্রয়োজন ছিল না, শুধু তাহাদের মুখের পানে চাহিয়াই আমি তাহা বুঝিয়াছিলাম।

তাই শুনলাম, আজ কোথায় নাকি তাহাদের সাপ-ধরাব বায়না আছে এবং তাহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে, আমিও অমনি সঙ্গে যাইবার জন্য লাফাইয়া উঠিলাম। ছেলে-বেলা হইতেই দুটা জিনিসের উপর আমার প্রবল সখ ছিল। এক ছিল গোখরো কেউটে সাপ ধরিয়া পোবা, আর ছিল ময়-সিদ্ধ হওয়া।

সিদ্ধ হওয়ার উপায় তখনও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়কে ওস্তাদ লাভ করিবার আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। সে তাহার নামজাদা শ্বশুরের শিষ্য, সূতরাং মস্ত লোক! আমার ভাগ্য যে অকস্মাৎ এমন স্বপ্রসন্ন হইয়া উঠিবে, তাহা কে ভাবিতে পারিত?

কিন্তু শুল্ক কাজ এবং ভয়ের কারণ আছে বলিয়া প্রথমে তাহার উভয়েই আপত্তি করিল, কিন্তু আমি এমনি নাছোড়বান্দা হইয়া উঠিলাম যে, মাস-খানেকের মধ্যে আমাকে সাগরেদ করিতে মৃত্যুঞ্জয় পথ পাইল না। সাপ-ধরার মন্ত্র এবং হিসাব শিখাইয়া দিল এবং কজ্জিতে ওষুধ-সমেত মাহুলি বাঁধিয়া দিয়া দস্তুরমত সাপুড়ে বানাইয়া তুলিল।

মন্ত্রটা কি জানেন? তার শেষটা আমার মনে আছে—

ওবে কেউটে তুই মনসার বাহন—

মনসা দেবী আমার মা—

ওলট পালট পাতাল-ফোড—

চোঁড়ার বিষ তুই নে, তোর বিষ চোঁড়ারে দে

—দুবরাজ, মণিরাজ!

কার আজ্ঞে—বিষহরিব আজ্ঞে!

ইহাব মানে যে কি, তাহা আমি জানি না। কারণ যিনি এই মন্ত্রেব দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন—নিশ্চয়ই কেহ না কেহ ছিলেন—তার সাক্ষাৎ কখনো পাই নাই।

অবশেষে এক দিন এই মন্ত্রেব সত্য মিথ্যার চরম মীমাংসা হইয়া গেল বটে, কিন্তু যত দিন না হইল, তত দিন সাপ-ধরার জগু চতুর্দিকে প্রসিদ্ধ হইয়া গেল। সবাই বলাবলি করিতে লাগিল, হাঁ, ছাড়া একজন গুণী লোক বটে। সন্ন্যাসী অবস্থায় কামাখ্যায় গিয়া সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে

এতটুকু বয়সের মধ্যে এত বড় ওস্তাদ হইয়া অহঙ্কারে আমার আর মাটিতে পা পড়ে না, এমনি জো হইল।

বিশ্বাস করিল না শুধু দুইজন। আমার গুরুশ্রদ্ধে, সে ত ভাল-মন্দ কোন কথাই বলিত না। কিন্তু বিলাসী মাঝে মাঝে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিত, ঠাকুর, এ সব ভয়ঙ্কর জানোয়ার, একটু সাবধানে নাড়া-চাড়া ক'রো। বস্তুতঃ বিষদাঁত ভাঙা, সাপের মুখ হইতে বিষ বাহির করা প্রভৃতি কাজগুলো এমনি অবহেলার সহিত করিতে শুরু করিয়াছিলাম যে, সেসব ~~মধ্যে~~ পড়িলে আমার আজও গা কাঁপে।

আসল কথা হইতেছে এই যে, সাপ-ধরাও কঠিন নয়, এবং ধরা সাপ দুই-চারি দিন হাঁড়িতে পুরিয়া রাখার পরে তাহার বিষদাঁত ভাঙাই হোক আর নাই হোক কিছুতেই কামড়াইতে চাহে না। চক্র তুলিয়া কামড়াইবার ভান করে, ভয় দেখায়, কিন্তু কামড়ায় না!

মাঝে মাঝে আমাদের গুরু-শিষ্যের সহিত বিলাসী তর্ক করিত। সাপুড়েনদের সবচেয়ে লাভের ব্যবসা হইতেছে শিকড় বিক্রি করা, যা দেখাইবামাত্র সাপ পলাইতে পথ পায় না। কিন্তু তার পূর্বে সামান্য একটু কাজ করিতে হইত। যে সাপটা শিকড় দেখিয়া পলাইবে, তাহার মুখে একটা লোহার শিক পুড়াইয়া বার-কয়েক ছাঁকা দিতে হয়। তার পরে তাহাকে শিকড়ই দেখান হোক আর একটা কাঠিই দেখান হোক, সে যে কোথায় পলাইবে ভাবিয়া পায় না। এই কাজটার বিরুদ্ধে বিলাসী ভয়ানক আপত্তি করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে বলিত, দেখ, এমন করিয়া মানুষ ঠকাইয়ো না।

মৃত্যুঞ্জয় কহিত, সবাই করে—এতে দোষ কি?

বিলাসী বলিত, করুক গে সবাই। আমাদের শু থাবার ভাবনা নেই, আমরা কেন মিছি মিছি লোক ঠকাতে যাই।

আর একটা জিনিস আমি বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি। সাপখরার বায়না আসিলেই বিলাসী নানা প্রকার বাধা দিবার চেষ্টা করিত—আজ শনিবার, আজ মঙ্গলবার, এমনি কত কি। মৃত্যুঞ্জয় উপস্থিত না থাকিলে সে ত একেবারেই ভাগাইয়া দিত, কিন্তু উপস্থিত থাকিলে মৃত্যুঞ্জয় নগদ টাকার লোভ সামলাইতে পারিত না। আর আমার ত এক রকম নেশার মত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। নানা প্রকারে তাহাকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টার ক্রটি করিতাম না। বস্তুতঃ ইহার মধ্যে মজা ছাড়া ভয় যে কোথায় ছিল, এ আমাদের মনেই স্থান পাইত না। কিন্তু এই পাপের দণ্ড আমাদের এক দিন ভাল করিয়াই দিতে হইল।

সে দিন ক্রোশ-দেড়েক দূরে এক গোয়ালার বাড়ি সাপ ধরিতে গিয়াছি। বিলাসী বরাবরই সঙ্গে যাইত, আজও সঙ্গে ছিল। মেটে-ঘরের মেজে খানিকটা খুঁড়িতেই একটা গর্তের চিহ্ন পাওয়া গেল। আমরা কেহই লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু বিলাসী সাপুড়ের মেয়ে—সে হেঁট হইয়া কয়েক টুকরা কাগজ তুলিয়া লইয়া আমাদের বলিল, ঠাকুর, একটু সাবধানে খুঁড়ো। সাপ একটা নয়, এক জোড়া ত আছে বটেই, হয় ত বা বেশিও থাকতে পারে।

মৃত্যুঞ্জয় বলিল, এরা যে বলে একটাই এসে ঢুকেছে। একটাই দেখতে পাওয়া গেছে।

বিলাসী কাগজ দেখাইয়া কহিল, দেখচ না বাসা করেছিল?

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, কাগজ ত ইঁদুরেও আন্তে পারে?

বিলাসী কহিল, দুই-ই হতে পারে। কিন্তু দুটো আছেই আমি বল্চি।

বাস্তবিক বিলাসীর কথাই ফলিল, এবং মর্যাদাসিক ভাবেই সে দিন ফলিল। মিনিট-দশেকের মধ্যেই একটা প্রকাণ্ড খরিশ গোখরো ধরিয়া

ফেলিয়া মৃত্যুঞ্জয় আমার হাতে দিল। কিন্তু সেটাকে বাঁপির মধ্যে পুরিয়া ফিরিতে না ফিরিতেই মৃত্যুঞ্জয় উঃ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতের উন্টা পিঠ দিয়া ঝবু ঝবু করিয়া রক্ত পড়িতেছিল।

প্রথমটা সবাই যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। কারণ সাপ ধরিতে গেলে সে পলাইবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া বরঞ্চ গর্ত হইতে এক হাত মুখ বাহির করিয়া দংশন করে, এমন অভাবনীয় ব্যাপার জীবনে এই একটিবার মাত্র দেখিয়াছি পরক্ষণেই বিলাসী চীংকার করিয়া ছুটিয়া গিয়া আঁচল দিয়া তাহার হাতটা বাঁধিয়া ফেলিল, এবং যত রক্তমের শিকড়-বাকড় সে সঙ্গে আনিয়াছিল, সমস্তই তাহাকে চিবাইতে দিল। মৃত্যুঞ্জয়ের নিজের মাহুলি ত ছিলই, তাহার উপরে আমার মাহুলিটাও খুলিয়া তাহার হাতে বাঁধিয়া দিলাম। আশা, বিষ ইহার উল্লে আর উঠিবে না। এবং, আমার সেই, “বিষ-হরির আঞ্জে” মন্ত্রটা সতেজে বারংবার আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। চতুর্দিকে ভিড় জমিয়া গেল এবং এ অঞ্চলের মধ্যে যেখানে যত গুণী ব্যক্তি আছেন, সকলকে খবর দিবার জন্য দিকে দিকে লোক ছুটিল। বিলাসীর বাপকেও সংবাদ দিবার জন্য লোক গেল।

আমার মন্ত্র পড়ার আর বিরাম নাই, কিন্তু ঠিক স্রবিধা হইতেছে বলিয়া মনে হইল না। তথাপি আবৃত্তি সমভাবেই চলিতে লাগিল। কিন্তু মিনিট পোনেরো-কুড়ি পরেই যখন মৃত্যুঞ্জয় একবার বমি করিয়া দিল, তখন বিলাসী মাটির উপরে একেবারে আছাড় খাইয়া পড়িল। আমিও বুঝিলাম, আমার বিষহরির দোহাই বুঝি-বা আরু খাটে না।

নিকটবর্তী আরও দুই-চারি জন ওস্তাদ আসিয়া পড়িলেন, এবং আমরা কখনো বা একসঙ্গে কখনো আলাদা তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর দোহাই পাড়িতে লাগিলাম। কিন্তু বিব দোহাই মানিল না, রোগীর অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে লাগিল। যখন দেখা গেল, ভাল কথায় হইবে না, তখন তিন-চার জন রোজা মিলিয়া, বিষকে এমনি অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ করিতে লাগিল যে, বিষের কান থাকিলে সে, মৃত্যুঞ্জয় ত মৃত্যুঞ্জয়, সে দিন দেশ ছাড়িয়া পলাইত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আরও আধ ঘণ্টা ক্ষত-ক্ষতীর পরে, রোগী তাহার বাপ-মায়ের দেওয়া মৃত্যুঞ্জয় নাম, তাহার স্বপ্নের দেওয়া মর্দোষধি, সমস্ত মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া ইহলোকের লীলা সাদ করিল। বিলাসী তাহার স্বামীর মাথাটা কোলে করিয়া বসিয়াছিল, সে যেন একেবারে পাথর হইয়া গেল।

যাক্, তাহার দুঃখের কাহিনীটা আর বাড়াইব না। কেবল এইটুকু বলিয়া শেষ করিব যে, সে সাত দিনের বেশি আর বাচিয়া থাকটা সহিতে পারিল না। আমাকে শুধু এক দিন বলিয়াছিল, ঠাকুর, আমার মাথার দিবিয় রইল, এ সব তুমি আর কখনো ক'রো না।

আমার মাহুলি-কবজ ত মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে কবরে গিয়াছিল, ছিল শুধু বিষহরির আঞ্জা। কিন্তু সে আঞ্জা যে ম্যাজিষ্ট্রেটের আঞ্জা নয়, এবং সাপের বিষ যে বাঙালীর বিষ নয়, তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম।

এক দিন গিয়া শুনিলাম, ঘরে ত বিষের অভাব ছিল না, বিলাসী আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে, এবং শাস্ত্রমতে সে নিশ্চয়ই নরকে গিয়াছে। কিন্তু যেখানেই যাক্, আমার নিজের যখন বাইবার সময় আসিবে, তখন, ওইরূপ কোন একটা নরকে যাওয়ার প্রস্তাবে পিছাইয়া দাঁড়াইব না, এই মাত্র বলিতে পারি।

খুড়ামশাই যোল আনা বাগান দখল করিয়া অত্যন্ত বিজ্ঞের মত চারিদিকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ওর যদি না অপঘাত মৃত্যু হবে, ত হবে কার? পুরুষমানুষ অমন একটা ছেড়ে দশটা করুক না, তাতে ত তেমন আসে যায় না—না হয় একটু নিন্দাই হ'তো। কিন্তু, হাতে ভাত খেয়ে মরতে গেলি কেন? নিজে ম'লো, আমার পর্য্যন্ত মাথা হেঁট করে গেল। না পেলো এক ফোঁটা আশ্বিন, না পেলো একটা পিণ্ডি, না হল একটা ভুজিয়া উজ্জুখ্য।

গ্রামের লোক একবাক্যে বলিতে লাগিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি! অন্ন-পাপ! বাপ রে! এর কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে!

বিলাসীর আত্মহত্যার ব্যাপারটাও অনেকের কাছে পরিহাসের বিষয় হইল। আমি প্রায়ই ভাবি, এ অপরাধ হয় ত উহার উভয়েই করিয়াছিল, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় ত পল্লীগ্রামেরই ছেলে, পাড়াগাঁয়ের তেল-জলেই ত মানুষ। তবু এত বড় দুঃসাহসের কাজে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল তাহাকে যে বস্ত্রটা, সেটা কেহ একবার চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইল না?

আমার মনে হয়, যে দেশের নর-নারীর মধ্যে পরস্পরের হৃদয় জয় করিয়া বিবাহ করিবার রীতি নাই, বরঞ্চ তাহা নিন্দার সামগ্রী, যে দেশের নর-নারী আশা করিবার সৌভাগ্য, আকাঙ্ক্ষা করিবার ভয়ঙ্কর আনন্দ হইতে চিরদিনের জন্ত বঞ্চিত, যাহাদের জয়ের গর্ক, পরাজয়ের ব্যথা, কোনটাই জীবনে একটিবারও বহন করিতে হয় না, যাহাদের ভুল করিবার দুঃখ, আব ভুল না করিবার আত্মপ্রসাদ, কিছুরই বালাই নাই, যাহাদের প্রাচীন এবং বহুদর্শী বিজ্ঞ সমাজ সর্ব-প্রকারের হান্ধায়া হইতে অত্যন্ত সাবধানে দেশের লোককে তফাৎ করিয়া, আজীবন কেবল ভালোটি হইয়া থাকিবারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাই বিবাহ-ব্যাপারটা যাহাদের শুধু

নিছক Contract তা সে যতই কেন না বৈদিক মন্ত্র দিয়া document পাঁকা করা হোক, সে দেশের লোকের সাধাই নাই, মৃত্যুঞ্জয়ের অন্ন-পাণের কারণে। বিলাসীকে ঝাঁহাবা পবিত্র করিয়াছিলেন, তাঁহারা সাধু গৃহস্থ এবং সাধবী গৃহিণী—অক্ষয় সত্যী-লোক তাঁহারা সবাই পাইবেন, তাও আমি জানি, কিন্তু সেই সাপুড়েব মেয়েটি যখন একটি পীড়িত, শয্যাগত লোককে তিল তিল কবিতা জয় করিতেছিল, তাহাব তখনকার সে গৌরবের কণামাত্রও হয় ত আজিও ইহাদেব কেহ চোখে দেখেন নাই। মৃত্যুঞ্জয় হয় ত নিতান্তই একটা তুচ্ছ মানুষ ছিল, কিন্তু তাহার হৃদয় জয় কবিতা দখল করাব আনন্দটাও তুচ্ছ নয়, সে সম্পদও অকিঞ্চিৎকর নহে।

এই বস্তুটাই এ দেশেব লোকের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন। আমি হৃদেববাবুব পাবিবারিক প্রবন্ধেবও দোষ দিব না এবং শাস্ত্রীয় তথ্য নামাজিক বিধি-ব্যবস্থারও নিন্দা করিব না। কবিলেও মুখেব উপব কড়া জবাব দিয়া ঝাঁহাবা বলিবেন, এই হিন্দু-সমাজ তাহার নিতুল বিধি-ব্যবস্থার জোবেই অত শতাব্দীর অতগুলো বিপ্লবের মধ্যে বাঁচিয়া আছে, আমি তাঁহাদেরও অতিশয় ভক্তি কবি, প্রত্যুত্তরে আমি কখনই বলিব না, টিকিয়া থাকা চরম সার্থকতা নয়, এবং অতিক্রম হস্তী লোপ পাইয়াছে, কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে। আমি শুধু এই বলিব যে, বডলোজ্জেক নন্দগোপালটির মত দিবাবাত্রি চোখে চোখে এবং কোলে কোলে বাথিলে যে সে বেশটি থাকিবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু একেবারে তেলাপোকাটির মত বাঁচাইয়া রাখার চেয়ে এক-আধবাব কোল হইতে নামাইয়া আরও পাঁচজন মানুষের মত ছ-এক পা হাঁটিতে দিলেও প্রায়শ্চিত্ত করাব মত পাপ হয় না।

মামলার ফল

বুড়া বন্দাবন সামন্তের মৃত্যুর পরে তাহার দুই ছেলে শিবু ও শম্ভু সামন্ত প্রত্যহ ঝগড়া লড়াই করিয়া মাস-ছয়েক একান্তে এক বাটিকে কাটাইল, তাহার পরে এক দিন পৃথক হইয়া গেল।

গ্রামের জমিদার চৌধুরীমশাই নিজে আসিয়া তাহাদের চাম বাস, জমি-জমা, পুকুর-বাগান সমস্ত ভাগ করিয়া দিলেন। ছোটভাই স্তম্ভে পুকুরের ওপারে খান-দুই মাটির ঘর তুলিয়া ছোটবোঁ এবং ছেলে পুঙ্গ লইয়া বাস্তু ছাড়িয়া উঠিয়া গেল।

সমস্তই ভাগ হইয়াছিল, শুধু একটা ছোট বাঁশঝাড় ভাগ হইতে পাইল না। কারণ শিবু আপত্তি করিয়া কহিল, চৌধুরীমশাই, বাঁশঝাড়টা আমার নিতান্তই চাই। ঘরদোর সব পুরানো হয়েছে, চালের বাঁতা বাকারি বদলাতে খোঁটাখুঁটি দিতে বাঁশ আমার নিত্য প্রয়োজন। গাছে কার কাছে চাইতে বাবে বলুন।

শম্ভু প্রতিবাদের জ্ঞাত উঠিয়া বড়ভাইয়ের মুখের উপর হাত নাড়িয়া বলিল, আহা, ওঁর ঘরদোর খোঁটাখুঁটিতেই বাঁশ চাই—আর আমার ঘরে কলাগাছ চিবে দিলেই হবে, না? সে হবে না; সে হবে না চৌধুরীমশাই, বাঁশঝাড়টা আমার না থাকলেই চলবে না, তা বলে দিচ্ছি।

মীমাংসা ঐ পর্যায়েই হইয়া রহিল। স্তবরাং সম্পত্তিটা রহিল দুই সন্নিবেশ। তাহার ফল হইল এই যে, শম্ভু একটা কক্ষিতে হাত দিতে

আসিলেও শিবু দা লইয়া তাড়িয়া আসে, এবং শিবুর স্ত্রী বাশঝাড়ের তলা দিয়া হাটিলেও শব্দ নাটি লইয়া মানিতে দৌড়ায়।

সেদিন সকালে এই বাশঝাড় উপলব্ধ করিয়াই উভয় পনিবারে তুমুল দাঙ্গা হইয়া গেল। ঘটাপূজা কিংবা এম্নি কি একটা দৈবকার্যে বড়বৌ গঙ্গামণিব কিছু বাশপাতাব আবশ্যক ছিল। পল্লীগ্রামে এ বস্তুটি দুর্লভ নয়, অন্যাসে অন্ত্র সংগ্রহ হইতে পাবিত, কিন্তু নিজের থাকিতে পরের কাছে হাত পাতিতে তাঁহার সবম-বোধ হইল। বিশেষতঃ তাঁহার মনে ভয়সা ছিল, দেবর এতক্ষণে নিশ্চয়ই মাঠে গিয়াছে—ছোটবৌ একা আস করিবে কি।

কিন্তু কি কারণে শব্দ সে দিন মাঠে বাহিন হইতে বিলম্ব হইয়াছিল। সে সবে মাত্র পান্ডা-ভাত শেষ করিয়া হাত ধুইবার উদ্যোগ করিতেছিল, এম্নি সময়ে ছোটবৌ গুরু-ঘাট হইতে উঠিপড়ি করিয়া ছুটিয়া আসিয়া স্বামীকে সংবাদ দিল। শব্দ কোথায় বহিল ঘরের ঘটি—কোথায় বহিল হাত মুখ ধোওয়া, সে রৈ-বাই শব্দে সমস্ত পাডাটা তোলপাড় করিয়া তিন লাফে আসিয়া এঁটো-হাতেই পাতা কয়টা কাড়িয়া লইয়া টান মারিয়া ফেলিয়া দিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বড়ভাজের প্রতি যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিল, সে সকল সে আর যেখানেই শিখিয়া থাকুক, রামায়ণের লক্ষণ-চরিত্র হইতে যে শিক্ষা করে নাই, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

এদিকে বড়বৌ কাদিতে কাদিতে বাড়ি গিয়া মাঠে স্বামীর নিকট খবর পাঠাইয়া দিল। শিবু লাগল ফেলিয়া কান্দে হাতে কবিয়া ছুটিয়া আসিল এবং বাশঝাড়ের অদূরে দাঁড়াইয়া অল্পপস্থিত কনিষ্ঠের উদ্দেশে অল্প ঘুবাইয়া চীৎকার করিয়া এমন কাণ্ড বাধাইল যে ভিড় জমিয়া গেল। তাহাতেও যখন কোভ মিটিল না, তখন সে জমীদার-বাড়িতে নাগিল

করিতে গেল এবং এই বলিয়া শাসাইয়া গেল যে চৌধুরীমশাই এর বিচার করেন ভালই, না হইলে সে সদরে গিয়া একনম্বর রুজু করিবে—তবে তাহার নাম শিবু সামন্ত ।

ওদিকে শম্ভু বাঁশপাতা-কাড়ার কর্তব্যটা শেষ করিয়াই মনের হুখে হাল গরু লইয়া মাঠে চলিয়া গিয়াছিল । জ্বর নিষেধ শুনে নাই । বাটিতে ছোটবোঁ একা । ইতিমধ্যে ভাণ্ডার আসিয়া চীৎকাবে পাড়া জুড় করিয়া বীরদর্পে এক তরফা জয়ী হইয়া চলিয়া গেলেন ; ভাদ্রবধু হইয়া সে সমস্ত কানে শুনিয়াও একটা কথাবও জবাব দিতে পারিল না । ইহাতে তাহার মনস্তাপ ও স্বামীর বিকল্পে অভিমানের অবধি বহিল না । সে রান্নাঘরের দিকেও গেল না । বিরস-মুখে দাওয়ার উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া রহিল ।

শিবুর বাড়িতেও সেই দশা । বড়বোঁ প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বামীর পথ চাহিয়া বসিয়া আছে । হয় সে ইহার একটা বিহিত ককক নয় সে জলটুকু পর্য্যন্ত মুখে না দিয়া বাপের বাড়ি চলিয়া যাইবে । ঢুটা বাঁশপাতাব জন্ত দেওরেব হাতে এত লাঞ্ছনা ।

বেলা দেড় প্রহর হইয়া গেল, তখনও শিবুর দেখা নাই । বড়বোঁ ছটফট করিতে লাগিল, কি জানি, চৌধুরীমশায়ের বাটী হইতেই বা তিনি নম্বর রুজু করিতে সোজা সদরে চলিয়া গেলেন ।

এমন সময় বাহিবেব দরজায় ঝনাং করিয়া সজোবে ধাক্কা দিয়া শম্ভুর বডছেলে গয়ারাম প্রবেশ করিল । বয়স তাহার ষোল সত্তর, কিংবা এমনি একটা কিছু । কিন্তু এই বয়সেই ক্রোধ এবং ভাবাটা তাহার বাপকেও ডিঙাইয়া গিয়াছিল । সে গ্রামেব মাইনর ইন্সুলে পড়ে । আজ-কাল মর্গিং-ইন্সুল, বেলা সাড়ে দশটায় ইন্সুলের ছুটী হইয়াছে ।

গয়্যারামেব যখন এক বৎসর বয়স, তখন তাহাব জননীর মৃত্যু হয়। তাহার পিতা শম্ভু পুনরায় বিবাহ করিয়া নূতন বধূ ঘরে আনিল বটে, কিন্তু এই মা-মরা ছেলেটিকে মানুষ করিবার দায় জ্যাঠাইমার উপরেই পড়িল এবং এতকাল দুই ভাই পৃথক্ না হওয়া পর্য্যন্ত এ ভার তিনিই বহন করিয়া আসিতেছিলেন। বিমাতাব সহিত তাহার কোন দিনই বিশেষ কোনও সম্বন্ধ ছিল না—এমন কি, তাহাব নতন বাড়িতে উঠিয়া যাওয়ার পরেও গয়্যারাম যেখানে যেদিন স্থবিধা পাইত, আহাব করিয়া লইত।

আজ সে ইস্কুলেব পর বাড়ি ঢুকিয়া বিমাতাব মুখ এবং আহাের বন্দোবস্ত দেখিয়া প্রজ্বলিত হতাশনবৎ এবাড়িতে আসিতেছিল। জ্যাঠাইমার মুখ দেখিয়া তাহার সেই আগুনে জল পড়িল না, কেবাসিন পড়িল। সে কিছুমাত্র ভূমিকা না করিযাই কহিল, ভাত দে জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা কখা কহিলেন না, যেমন বসিয়াছিলেন, তেমনি বসিয়া রহিলেন।

ক্রুদ্ধ গয়্যারাম মাটিতে একটা প, ঠুকিয়া বলিল, ভাত দিবি, না দিবি নে, তা বল্ ?

গঙ্গামণি সক্রোধে মুখ তুলিয়া তর্জ্জন কবিয়া কহিলেন, তোর জন্তে ভাত বেঁধে বসে আছি—তাই দেব। বল, তোব সংমা আবাগী ভাত দিতে পারবে না বে এখানে এসেছি হাঙ্গামা করতে ?

গয়্যারাম চোঁচাইয়া বলিল, সে আবাগীর কথা জানি নে ? তুই দিবি কি না বল্ ? না দিবি ত চল্লুম, আমি তোর সব হাঁড়ি-কুঁড়ি ভেঙে দিতে। বলিয়া সে গোলার নিচে চালাকাঠের গাদা হইতে একটা কাঠ তুলিয়া সবেগে রন্ধনশালার অভিমুখে চলিল।

জ্যাঠাইমা সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, গয়া! হারামজাদা

দস্তি। বাড়াবাড়ি করিস্ নি বলছি। হুস্মিন হয় নি আমি নতুন হাঁড়ি-
কুঁড়ি কেড়েছি, একটা কিছু ভাঙে তোব জ্যাঠাকে নিয়ে তোব একথানা
পা যদি না ভাঙাই ত তখন বলি হাঁ।

গয়্যারাম বাম্বাঘরের শিকলটায় গিয়া হাত দিয়াছিল, হঠাৎ একটা
নূতন কথা মনে পড়ায় সে অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,
আচ্ছা ভাত না দিস্ না দিবি। আমি চাই নে। নদীৰ ধারে বটতলায়
বামুনদের মেয়েরা সব ধামা ধামা চিঁড়ে মুড়কি নিয়ে পূজো করচে, যে
চাইচে, দিচ্ছে, দেখে এলুম। আমি চললুম তেনাদের কাছে।

গঙ্গামণির তৎক্ষণাৎ মনে পড়িয়া গেল, আজ অরণ্যাবধী, এবং এক
মুহূর্ত্তেই তাঁহার মেজাজ কড়ি হইতে কোমলে নামিয়া আসিল। তথাপি
নুখের জোর রাখিয়া কহিলেন, তাই ঘা না। কেমন খেতে পাস্ দেখি ?

দেখিস্ তখন, বলিয়া গয়া একথানা ছেঁড়া গামছা টানিয়া লইয়া
কোমরে জড়াইয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেই গঙ্গামণি উত্তেজিত হইয়া
বলিলেন, আজ ষষ্ঠীর দিনে পবেব পবে চেয়ে খেলে তোয় কি ভগ্নতি
কবি, তা দেখিস্ হতভাগা।

গয়া জবাব দিল না। শাম্মাঘবে ঢুকিয়া এক খামুচা তেল লইয়া
মাথায় ঘষিতে ঘষিতে বাহির হইয়া যায় দেখিয়া জ্যাঠাইমা উঠানে
নামিয়া আসিয়া ভয় দেখাইয়া কহিলেন, দস্তি কোথাকার। ঠাকুর-
দেবতার সঙ্গে গোঁয়ারতুমি। ডুব দিয়ে ফিরে না। এলে ভাল হবে না
কলে দিচ্ছি। আজ আমি রেগে রয়েছি।

কিন্তু গয়্যারাম ভয় পাইবার ছেলে নয়। সে শুধু দাঁত বাহির করিয়া
জ্যাঠাইমাকে বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

লাগিলেন, আজ বঙ্গীর দিন কার ছেলে ভাত খায় যে, তুই ভাত খেতে চাস? পাটানি-গুড়ের সন্দেশ দিয়ে, চাপাকলা দিয়ে, দুধ দই দিয়ে ফলার করা চলে না যে, তুই বাবি পরের ঘরে চেয়ে খেতে? কৈবর্তের ঘরে তুমি এমনি নবাব জন্মেছ?

গয়া কিছু দূরে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তবে তুই দিলি নি কেন পোড়ারমুখি? কেন বল্লি নেই?

গঙ্গামণি গানে হাত দিয়া অবাক হইয়া বলিলেন, শোন কথা ছেলের! কখন আবার বল্লুম তোকে কিছু নেই? কোথায় চান, কোথায় ক, মস্তির মত ঢুকেই বলে, দে ভাত। ভাত কি আজ খেতে আছে যে দেব? আমি বলি, সবই ত মজুত, ডুবটা দিয়ে এলেই—

গয়া কহিল, ফলাব তোর পচুক। রোজ রোজ আবগারী ঝগড়া করে রান্নাঘরের শেকল টেনে দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে থাকবে আর রোজ আমি তিনপোর বেলায় ভাতে-ভাত খাবো? না আমি তোদের কারুর কাছে খেতে চাই নে, বলিয়া সে হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া গঙ্গামণি সেইখানে দাঁড়াইয়া কাদ কাদ গলায় চেঁচাইতে লাগিলেন, আজ বঙ্গীর দিনে কারো কাছে চেয়ে গেয়ে অমঙ্গল করিস্ নে গয়া—রাস্তা বাপ অমোদ—না হয় চারটে পয়সা দেবো বে শোন্—

গয়ায়াম জ্রফেপও করিল না, জ্রতবেগে প্রস্থান করিল। বলিতে বলিতে গেল, চাই নে আমি ফলার, চাই নে আমি পয়সা। তোর ফলারে আমি—ইত্যাদি ইত্যাদি।

দে দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেলে, গঙ্গামণি বাড়ি ফিরিয়া রাগে, দুঃখে, অভিমানে নিজের মত দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িলেন এবং গয়ার কুবাবহারে মর্শাহত হইয়া তাহার বিমাতার মাথা খাইতে লাগিলেন।

কিন্তু নদীর পথে চলিতে চলিতে গয়ার জ্যাঠাইমার কথাগুলো কানে বাজিতে লাগিল। একে উত্তম আহাবের প্রতি স্বভাবতই তাহাব একটু অধিক লোভ ছিল। পাটালি-গুডেব সন্দেশ, দবি, দুধ, চাপাকলা—তাহাব উপর চার পয়সা দক্ষিণা—মনটা তাহার দ্রুত নরম হইয়া আসিতে লাগিল।

মান সারিষা গয়ারাম প্রচণ্ড ক্ষুধা লইয়া ফিবিয়া আসিল। উঠানে দাঁড়াইয়া ডাক দিল, ফলাবেব সব শীগ্গির নিবে আব জ্যাঠাইমা—আমাব বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। কিন্তু পাটালি-সন্দেশ কম দিবি ত আজ তোকেই থেয়ে ফেল্‌বো।

গঙ্গামণি সেইমাত্র গরুর কাজ করিতে গোয়ালে ঢুকিয়াছিলেন। গয়াব ডাক শুনিয়া মনে মনে প্রমাদ গণলেন। ঘবে দুধ দই চিঁড়ি গুড ছিল বটে, কিন্তু চাপাকলাও ছিল না, পাটালি-গুডের সন্দেশও ছিল না। তখন গয়াকে আটকাইবার জগা যা মুখে আসিয়াছিল, তাই বলিয়া লোভ দেখাইয়াছিলেন।

তিনি সেইখান হইতে সাড়া দিয়া কহিলেন, তুই ততক্ষণ ভিজ্ঞে কাপড় ছাড়্ বাবা, আমি পুকুর থেকে হাত ধুয়ে আসছি।

শীগ্গিব আয়, বলিয়া হুকুম চালাইয়া গয়া কাপড় ছাড়িয়া নিজেই একটা আসন পাতিয়া ঘটিতে জল গড়াইয়া প্রস্তুত হইয়া বসিল। গঙ্গামাণ তাতাতাতি হাত ধুইয়া আসিয়া তাহার প্রসন্ন মেজাজ দেখিয়া খুসি হইয়া বলিলেন, এই ত আমার লক্ষ্মী ছেলে। কথায় কথায় কি বাগ করিতে আছে বাবা। বলিয়া তিনি ভাঁড়াব হইতে আহাবের সমস্ত আয়োজন আনিয়া সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

গয়ারাম চক্ষের পলকে উপকরণগুলি দেখিয়া লইয়া তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, চাপাকলা কই ?

গঙ্গামণি ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, ঢাকা দিতে মনে নেই বাবা, সব কটা ইউনে খেয়ে গেছে। একটা বেয়াল না পুস্লে আর নয় দেখছি।

গয়া হাসিয়া বলিল, কলা কখন ইবে খায়? তোর ছিল না তাই কেন বল না?

গঙ্গামণি অবাধ হইয়া কহিলেন, সে কি কথা রে! কলা ইহুবে খায় না?

গয়া চিঁড়া দই মাগিতে মাগিতে বলিল, আচ্ছা, খায়, খায়, কলা আমার দরকাব নেই, পাটালি-গুড়ের সন্দেশ নিয়ে আয়। কম আনি নি যেন।

জ্যাঠাইমা পুনবায় ভাড়াবে ঢুকিয়া মিছামিছি কিছুক্ষণ হাঁড়ি-কুঁড়ি নাড়িয়া সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, বাঃ—এও ইহুবে খেয়ে গেছে বাবা, এক ফোঁটা নেই, কখন মন-ভুলান্তে হাঁড়ির মুখ খুলে রেখেছি—

তাহার কথা শেষ না হইতেই গয়া চোখ পাকাইয়া চোঁচাইয়া উঠিল, পাটালি-গুড় কখন ইহুবে খায় দাফুসী—আমার সঙ্গে চালাকি? তোর কিছু যদি নেই, তবে কেন আমাকে ডাকিলি?

জ্যাঠাইমা বাহিরে আসিয়া বলিলেন, সত্যি বল্চি গয়া—

গয়া লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, তবু বল্চি সত্যি, যা—আমি তোর কিছু খেতে চাই নি, বলিয়া সে পা দিয়া টান মারিয়া সমস্ত আয়োজন উঠানে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, আচ্ছা, আমি দেখাচ্ছি মজা, বলিয়া সে সেই চালা-কাঠটা হাতে তুলিয়া ভাড়ারের দিকে ছুটিল।

গঙ্গামণি হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া গিয়া পড়িলেন, কিন্তু চক্ষের নিমেষে ক্রুদ্ধ গয়ারাম হাঁড়ি-কুঁড়ি ভাঙ্গিয়া জিনিস-পত্র ছড়াইয়া একাকার করিয়া

দিল। বাধা দিতে গিয়া তিনি হাতেব উপব সামান্য একটু আঘাত পাইলেন।

ঠিক এমন সময়ে শিবু জমিদার-বাটী হইতে ফিরিয়া আসিল। হাঙ্গামা শুনিয়া চীৎকার-শব্দে কারণ জিজ্ঞাসা কবিতেই গঙ্গামণি স্বামীর সাদা পাইয়া কাদিয়া উঠিলেন এবং গব্বারাম হাতের কাঠটা ফেলিয়া দিয়া উদ্ধ্বাসে দৌড় মারিল।

শিবু ক্রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করিল, ব্যাপার কি ?

গঙ্গামণি কাদিয়া কহিল, গব্বা আমার সখস্ব ভেঙ্গে দিবে হাতে আমার এক বা বসিয়ে দিবে পালিয়েছে—এই দেখ ফলে উঠেছে। বলিয়া সে স্বামীকে হাতটা দেখাইল।

শিবুর পশ্চাতে তাহার ছোটস্বামী জিন। হুঁসিয়াব এবং লেখাপড়া জানে বলিয়া জমিদার-বাটীতে বাইবান সময় শিবু তাহাকে ও-পাড়া হইতে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল। সে কহিল, সামন্তমশাই, এ সমস্ত ঐ ছোটসামন্তর কারসাজী। ছেলেকে দিবে সেই এক কাজ করিয়েছে। কি বল দিদি, এই নয় ?

গঙ্গামণির তখন অণুর জলিতেছিল, সে তৎক্ষণাৎ ষাড নাড়িয়া কহিল, ঠিক ভাই। ওই মুগপোডাই ছোড়াকে শিথিলে দিবে আমাকে মার খাইয়েছে। এর কি করবে তোমরা কর নইলে আমি গলার দড়ি দিয়ে মরুব।

এত বেলা পর্যন্ত শিবুর নাওয়া খাওয়া নাষ্ট, জমিদারের কাছেও স্ববিচার হয় নাই, তাহাতে বাড়ি পা দিতে না দিতে এই কাণ্ড, তাহার দ্বারা তিতাহিত জ্ঞান রহিল না। সে প্রচণ্ড একটা শপথ করিয়া বলিয়া উঠিল, এই আমি চল্লুম খানায় দারোগার কাছে। এর বিহিত না কর্তে পারি ত আমি বিন্দু সামন্তর ছেলে নই।

তাহার শালা লেখাপড়া-জানা লোক, বিশেষতঃ তাহার গয়ার উপর আগে হইতেই আকোশ ছিল, সে কহিল, আইন মতে এর নাম অনধিকার প্রবেশ। লাঠি নিয়ে বাড়ি চড়াও হওয়া, জিনিস-পত্র ডাঙা, মেয়েমানুষের গায়ে হাত তেলনা—এর শাস্তি ছমাস জেল। সামন্তমণাঠি, তুমি কোমর বেঁধে দাঁড়াও দেখি, আমি কেমন না বাপ-বেটাকে একসঙ্গে জেলে পুরতে পারি।

শিবু আর বিরক্তি করিল না, সম্বন্ধীর হাত ধরিয়া থানায় দারোগার উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

গঙ্গামণির সকলের চেয়ে বেশি রাগ পাড়িয়াছিল, দেবর ও ছোটবধূর উপর। সে এই লইয়া একটা তলতুল করিবার উদ্দেশে কবাটে শিকল তুলিয়া দিয়া সেই চালা কাঠ হাতে করিয়া সোজা শত্ৰুর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। উচ্চকণ্ঠে কহিল, কেমন গো ছোটকর্তা, ছেলেকে দিয়ে অমাকে মার খাওয়াবে। এখন বাপ-বেটার একসঙ্গে ফাটকে যাও।

শত্ৰু সেই মাত্র তাহার এ পক্ষের ছেলেটাকে লইয়া ফলার শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়াছে, বড়ভাজের মূর্তি এবং তাহার হাতের চালা-কাঠটা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কহিল, হয়েছে কি? আমি ত কিছুই জানি নে!

গঙ্গামণি মুখ বিকৃত করিয়া জবাব দিল, আর ছাক। সাজতে হবে না। দারোগা আসচে, তার কাছে গিয়ে ব'লো, কিছুই জানি কি না?

ছোটবোঁ ঘর হইতে বাহির হইয়া একটা খুঁটি ঠেস দিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল, শত্ৰু মনে মনে ভয় পাইয়া কাছে আসিয়া গঙ্গামণির একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, মাইসি বলছি বড়বোঁঠান, আমরা কিছুই জানি নে।

কথাটা যে সত্য, বড়বো তাহা নিজেও জানিত, কিন্তু তখন উদারতাব সময় নয়। সে শত্ৰু মুখের উপরেই যোল আনা দোষ চাপাইয়া—সত্য মিথ্যায় জড়াইয়া গবারামেব কীর্তি বিবৃত করিল। এই ছেলেটাকে যাহারা জানে, তাহাদের পক্ষে ঘটনাটা অবিশ্বাস করা শক্ত।

স্বল্পভাষিণী ছোটবোঁ এতক্ষণে মুখ খুলিল, স্বামীকে কহিল, ক্যামন, যা বলেছিছ তাই হল কি না—কত দিন বলি, ওগো দস্তি ছোঁড়াটাকে আব ঘরে ঢুকতে দিয়ো নি, তোমার ছোট ছেলেটাকে না-হক্ মেয়ে মেয়ে কোন্ দিন খুন কবে ফেলবে। তা গেবাহিই হয় না—এখন কথা খাটলো ত ?

শত্ৰু অল্পনয় কবিয়া গঙ্গামণিকে কহিল, আমাব দিবি বড়বোঁঠান, দাদা সত্যি নাকি থানায় গেছে ?

তাহাব ককল কর্ণবরে কতকটা নরম হইয়া বড়বোঁ জোব দিয়া বলিল, তোমাব দিবি ঠাকুরপো গেছে, সঙ্গে আমাদের পাঁচুও গেছে।

শত্ৰু অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিল। ছোটবোঁ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, নিত্যি বলি দিদি, কোথায় যে নদীর ওপর সরকারী পু। হচ্ছে, কত লোক গাটতে যাচ্ছে, সেথায় নিষে গিয়ে ওরে কাজে লাগিয়ে দাও। তাবা চাবক মাঝে আব কাজ করাবে—পালাবার ঘোটি নেই—ছদ্দিনে সোজা হয়ে যাবে। ত ন—ইন্তুলে দিয়েছি পডুক। ছেলে যেন ওর উকিল মোক্তার হবে।

শত্ৰু কাতর হইয়া বলিল, আবে সাধে দিই নি সেখানে। সবাই কি ঘরে ফিরতে পায়—এদেক লোক মাটি চাপা হয়ে কোথায় তলিয়ে যায়, তার তল্লাসই মেলে না।

ছোটবোঁ বলিল, তবে বাপ-ব্যাটাতে মিলে ফাটকে খাটগে যাও।

বড়বৌ চুপ করিয়া রহিল। শত্ৰু তাহার হাতটা ধরিয়া বলিল, আমি কালই ছোঁড়াকে নিয়ে গিয়ে পাচলার পুলে কাজে লাগিয়ে দেব, বোঁঠান, দাদাকে ঠাণ্ডা কর। আর এমন হবে না।

তাহার স্ত্রী কহিল, ঝগড়া-ঝাঁটি ত শুধু ঐ ডাক্তারার জন্তে। তোমাকেও ত কতবার বলিচি দিদি, ওবে ঘবে দোরের ঢুকতে দিয়ো না—স্বাক্ষার দিয়ো না। আমি বলি নে তাই, নইলে ও-মাসে তোমাদের মর্তমান কলার কাঁদিটে রাভিরে কে কেটে নিয়েছিল? সে ত ঐ দস্তি। যেমন কুকুর তেমন মুণ্ডুর না হ'লে কি চলে? পুলের কাজে পাঠিয়ে দাও, পাড়া জুড়ুক?

শত্ৰু মাতৃদ্রব্য করিল যে, কাল যেমন করিয়া হোক ছোঁড়াকে গ্রাম ছাড়া করিয়া তবে সে জল-গ্রহণ করিবে।

গঙ্গামণি এ কথাতেও কোন কথা কহিল না, হাতের কাঠটা ফেলিয়া দিয়া নিশেধে বাড়ি ফিরিয়া গেল।

স্বামী, ভাই এখনও অজ্ঞাত। অপরাহ্ন-বেলায় সে বিধব-মুখে ঝগড়ার দোরে বসিয়া তাহাদেরই খাবার আয়োজন করিতেছিল, গয়ারাম উকি ঝুঁকি মারিয়া নিশেধ পদে প্রবেশ করিল। বাটীতে আর কেহ নাই দেখিয়া সে সাহসে ভর করিয়া একেবারে পিছনে আসিয়া ডাক দিল, জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না। গয়ারাম অদূরে ক্লান্তভাবে ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িয়া কহিল, আচ্ছা, যা আছে তাই দে, আমার বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

খাবার কথায় গঙ্গামণির শাস্ত ক্রোধ মুহূর্ত্তে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। তিনি তাহার মুখের প্রতি না চাহিয়াই সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন,

বেহায়া! পোড়ারমুখো! আবার আমার কাছে এসেছিস্ শ্বিদের বলে? দূর হ এখান থেকে।

গয়া কহিল, দূর হব তোব কথায়?

জ্যাঠাইমা ধমক দিয়া কহিলেন, হারামজাদা, নচ্চার। আমি আবার দেবো খেতে?

গয়া বলিল, তুই দিবি নি ত কে দেবে? কেন তুই ইঁদুরের দোষ দিয়ে মিছে কথা বল্গি? কেন ভাল কবে বল্গি নি, বাবা, এই দিয়ে খা, আজ আর কিছু নেই! তা হলে ত আমার রাগ হয় না। দে না খেতে শীগগির রাফসী, আমার পেট যে জলে গেল!

জ্যাঠাইমা কণকাল মৌন থাকিয়া, মনে মনে একটু নরম হইয়া বলিলেন, পেট জলে থাকে তোব সন্মার কাছে যা।

বিমাতার নামে গয়া চক্ষের পলকে আগুন হইয়া উঠিল। বলিল, সে আবাগীর নাকি আমি আর মুখ দেখবো? শুধু ঘরে আমার ছিঁট! আনতে গেছি, বলে, দূর! দূর! এইবার জেলের ভাত খেগে যা! আমি বললুম, তোদের ভাত আমি খেতে আসি নি—আমি জ্যাঠাইমার কাছে যাচ্ছি। পোড়ারমুখী কম শয়তান! ঐ গিরে লাগিয়েচে বলেই ত বাবা তোব হাত-থেকে বাণ-পাতা কেড়ে নিয়েচে। বলিয়া সে সজোরে মাটিতে একটা পা তুলিয়া কহিল, তুই রাফসী নিজে পাতা আন্তে গিরে অপমান হ'লি? কেন আমার বল্গি নি? ঐ বাণঝাড় সমস্ত আমি যদি না আগুন দিয়ে পোড়াই ত আমার নাম গয়া নয়, তা দেখিস্! আবাগী আমাকে বল্লে কি জানিস্ জ্যাঠাইমা? বলে তোব জ্যাঠাইবাবার খবর পাঠিয়েচে, দারোগা এসে বেঁধে নিয়ে তোকে জেল দেবে। বল্গি কথা হতভাগীর?

গঙ্গামণি কহিলেন, তোব জ্যাঠামশাই পাচুকে সঙ্গে নিয়ে গেছেই ত থানায়। তুই আমাব গানে হাত তুলিস্—এত বড় তোর আশ্পর্কী ?

পাচুকে গয়া একেবারে দেবিত্যে পারিত না। সে আবার যোগ দিবাছে জুনিয়া জুনিয়া উঠিয়া বলিল, কেন তুই রাগের সময় আমাকে আটকানো গেলি ?

গঙ্গামণি কহিলেন, তাই আমাকে মারবি ? এখন যা, কাটকে বাধা থাক্ গে যা।

গয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া বলিল, ইঃ—তুই আমাকে কাটকে দিবি ? দে না, দিয়ে একবার মজা নেপ্ না। আপনিত্ কেঁদে কেঁদে মরে যাবি—আমাব কি হবে !

গঙ্গামণি কহিলেন, আমাব বয়ে গেছে। দিতে। যা, আমার স্বমুখ থেকে যা বল্চি, শঙ্কর বালাই বোখাকাব।

গয়া চোঁচাইয়া কহিল, তুই আগে থেতে দে না তবে ত যাবো। কখন স্নাত সন্ধ্যা দুটি মুড়ি খেয়েচি বল্ ত ? ফিদে পায় না আমার ?

গঙ্গামণি কি একটা বলিতে বাইতেছিলেন, এমন সময় শিবু পাচুকে লইয়া থান। হইতে ফিরিয়া আসিল এবং গয়ার প্রতি চোখ পড়িবামাত্রই বারুদেব মত জুনিয়া উঠিয়া চীৎকার করিল, হারামজাদা পাঙ্গী আবার আমার বাড়ি ঢুকেছে। বেরো, বেরো বল্ছি ! পাচু পর ত শুরোরকে।

বিদ্রোহের গয়্যারাম সবজা দিয়া দেউ মারিল। চোঁচাইয়া বলিয়া গেল—পেঁচোশালার একটা ঠগা না ভেবে দিই ত আমার নামই গয়্যারাম নয়।

চক্ষের পলকে এই কাণ্ড ঘটিয়া গেল। গঙ্গামণি একটা কথা কহিবারও অবকাশ পাইল না।

ক্রুদ্ধ শিবু স্ত্রীকে বলিল, তোর আশ্বারা পেয়েই ও এমন হচ্ছে। আব যদি কখন হারামজাদাকে বাডি ঢুকতে দিস্ ত তোর অতি বড় দিবিয়া রইল।

পাঁচু বলিল, দিদি, তোমাদের কি, আমারই সর্বনাশ। কখন রাত-ভিতে লুকিয়ে আমার ঠ্যাঙেই ও ঠ্যাঙা মাব্বে দেখ্‌চ্‌চি।

শিবু কহিল, কাল সকালেই যদি না পুলিশ পেঘাদা দিয়ে ওব তাতে দডি পরাই ত আমার—ইত্যাদি—ইত্যাদি।

গঙ্গামণি কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল—একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। ভীতু পাঁচকড়ি সে বাত্রে আর বাড়ি গেল না। এইখানে শুইয়া বহিল।

পরদিন বেলা দশটাব সময় ফোশ-ছুই দূরের পথ হইতে দারোগাবাব উপযুক্ত দক্ষিণাদি গ্রহণ কবিয়া পাক্কী চড়িয়া কনেষ্টবল ও চৌকিলাত্বাদি সমভিব্যাহারে সরদামিনে তদন্ত কবিত্তে উপস্থিত হইলেন। অনধিকার প্রবেশ, জিনিস-পত্র তছকপাত, চালা-কাঠেব দ্বারা স্ত্রীলোকের অঙ্গে প্রহার—ইত্যাদি বড় বড় ধাবার অভিযোগ—সমস্ত গ্রামময় একটা হলস্থল পড়িয়া গেল।

প্রধান আসামী গয়্যাবাম—তাহাকে কৌশলে বরিয়া আনিয়া, হাজিব করিতেই, সে কনেষ্টবল, চৌকিদার প্রভৃতি দেখিয়া ভয়ে কাঁদিয়া দেনিয়া বলিল, আমাকে কেউ দেখ্‌তে পারে না ব'লে আমাকে ফাটকে দিতে চায়। দারোগা বুঝামান্তুষ। তিনি আসামীর বয়স এবং কান্না দেখিয়া দয়াদ্রুতিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে কেউ ভালবাসে না গয়্যাবাম ?

গয়া কহিল, আমাকে শুধু আমার জ্যাঠাইমা ভালবাসে, আর কেউ না।

দারোগা প্রশ্ন কবিল, তবে জ্যাঠাইমাকে মেরেচ কেন ?

গয়া বলিল, না, মারি নি। কবাটের আড়ালে গঙ্গামণি দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই দিকে চাহিয়া কহিল, তোকে আমি কখন মেরেচি জ্যাঠাইমা ?

পাচু নিকটে বসিয়াছিল, সে একটু কটাক্ষে চাহিয়া কহিল, দিদি, ভজুব জিজ্ঞেস করুচেন সত্যি কথা বল। ও কাল দুপুর বেলা বাড়ি চড়াও হ'য়ে—কাঠের বাড়ি তোমাকে মারে নি ? দশমাবতাবেব কাছে যেন মিথ্যা কথা বল না।

গঙ্গামণি অশ্রুতে ষাহা ঝড়িলেন, পাচু তাহাই পবিস্মৃত কবিয়া বলিল, হাঁ ভজুব, আমার দিদি বলুচেন, ও নেবেচে।

গয়া অগ্নিসৃষ্টি হইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, ছাপ পেচে, তোব আমি না পা ভাঙি ত—বাগে কথাটা। তব সম্পূর্ণ হইতে পাইল না—কাঁদিয়া ফেলিল।

পাচু উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠি, দেখলেন হতু্যব। দেখলেন। ওজুয়েব স্তম্বেই বলুছে পা ভেঙে দেবে—আড়ালে ঝুঁ খুন কবতে পারে। ওকে বাঁধবার ভবন হোব।

দারোগা শুধু একটু হাসিলেন। গয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, আমার মা নেই তাই। নইনে—এ বাবেও কথাটা তাহাব শেষ হইতে পারিল না। যে মাকে তাহাব মনেও নাই, মনে কবিবাব কখনও প্রয়োজনও হয় নাই, আজ বিপদের দিনে অকস্মাৎ তাঁহাকেই ডাকিয়া সে ঝর ঝর কবিয়া কাঁদিতে লাগিল।

দ্বিতীয় আসামী শম্ভুর বিরুদ্ধে কোন কথাই প্রমাণ হইল না। দারোগাবাবু আদালতে নালিশ করিবার হুকুম দিয়া রিপোর্ট লিখিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। পাঁচু মামলা চালানো, তাহার ষথারীতি ভদ্রিাদির দায়িত্ব গ্রহণ করিল এবং তাহার ভগিনীর প্রতি গুরুতর অত্যাচারের জ্ঞাপন করার যে কঠিন শাস্তি হইবে, এই কথা চতুর্দিকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কিন্তু গয়া সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ। পাড়া-প্রতিবেশীরা শিবুর এই আচরণে নিন্দা করিতে লাগিল। শিবু তাহাদের সহিত লড়াই করিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু শিবুর স্ত্রী একেবারে চূপচাপ। সে দিন গয়ার দূর-সম্পর্কের এক মানি খবর শুনিয়া শিবুর বাড়ি বহিয়া তাহার স্ত্রীকে যা ইচ্ছা তাই বলিয়া গালিগালাজ করিয়া গেল, কিন্তু গঙ্গামনি একেবারে নিকবাক হইয়া রহিল। শিবু পাশেব বাড়ির লোকেব কাছে এ কথা শুনিয়া রাগ করিয়া স্ত্রীকে কহিল, তুই চূপ কবে বইলি? একটা কথাও বল্লি নে?

শিবুর স্ত্রী কহিল, না।

শিবু বলিল, আমি বাড়ি থাকলে মাগীকে ঝাটা-পেটা করে চেঁচো দিতুম।

তাহার স্ত্রী কহিল, তা হ'লে আজ থেকে বাড়িতেই ব'সে থেকে, আর কোথাও বেরিও না। বলিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেল।

সে দিন দুপুর-বেলায় শিবু বাড়ি ছিল না। শম্ভু আসিয়া বাশ-বাড হইতে গোটা-কয়েক বাশ কাটিয়া লইয়া গেল। শম্ভু শুনিয়া শিবুর স্ত্রী বাহিরে আসিয়া স্বচক্ষে সমস্ত দেখিল। কিন্তু বাধা দেওয়া দূরে থাকুক আজ সে কাছেও ঘেঁষিল না, নিঃশব্দে ঘরে ফিরিয়া গেল। দিন-দুই পরে সংবাদ শুনিয়া শিবু লাফাইতে লাগিল। স্ত্রীকে আসিয়া কহিল, তুই

কি কানের মাথা খেয়েছি? ঘরের পাশ থেকে সে বাঁশ কেটে নিয়ে গেল, আর তুই টের পেলি না?

তাহার স্ত্রী বলিল, কেন টের পাব না, আমি চোখেই ত সব দোষটি!

শিবু ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, তবু আমাকে তুই জানালি নে?

গন্ধামণি বলিল, জানাবো আবার কি? বাঁশ-ঝাড় কি তোমার একার? ঠাকুরপোর তাতে ভাগ নেই?

শিবু বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া শুধু কহিল, তোর কি মাথা গায়াপ হ'য়ে গেছে?

সে দিন সন্ধ্যার পর পাচু সদর হইতে কিরিয়া আসিয়া শাস্ত্রভাবে বস্প্রকরিয়া বসিয়া পড়িল। শিবু গরুর জুগ খড় কুচাইতে ছিল, অন্ধকারে তাহার মূখের চোখের চাপা হাসি লক্ষ্য কবিল না—সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কি হলো?

পাচু গান্ধীম্যের সহিত একটু হাস্য করিয়া কহিল, পাচু থাকলে ঘা হয় তাই! ওয়ারি করে তবে আসছি। এগন কোথায় আছে জানতে পারলেই হয়।

শিবু একপ্রকার ভয়ানক জিদ চড়িয়া গিয়াছিল। সে কহিল, যত খরচ হোক ছোড়াকে ধরাই চাই। তাকে জেলে পুরে তবে আমার অল্প কাজ। তার পরে উভয়ের নানা পরামর্শ চলিতে লাগিল। কিন্তু গাজি এগারোটা বাজিয়া গেল, ভিতর হইতে আহারের আহ্বান আসে না দেখিয়া শিবু আশ্চর্য হইয়া রাস্তাঘরে গিয়া দেখিল ঘর অন্ধকার।

গোবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, স্ত্রী মেজের উপর মাহুর পাতিয়া শুইয়া আছে। ক্রুদ্ধ এবং আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবার হ'য়ে গেছে ত আমাদের ডাকিস নি কেন?

গঙ্গামণি ধীরে স্তম্বে পাশ ফিরিয়া বলিল, কে রাঁধলে যে খাবাব হায়ে গেছে ?

শিবু তর্জ্জন করিয়া প্রশ্ন করিল, রাঁধিস্ নি এখনো ?

গঙ্গামণি কহিল, না। আমার শরীর ভাল নেই, আশ্চর্য আমি পারব না। নিদারুণ ক্ষুধায় শিবুর নাড়ী জ্বলিতেছিল, সে আব সহিতে পারিল না। শায়িত স্ত্রীর পিঠের উপর একটা লাথি মারিয়া বলিল, আজকাল রোজ অস্থখ, রোজ পারব না। পাবুবি নে ত বেবো আমার বাড়ি থেকে।

গঙ্গামণি কথাও কহিল না, উঠিয়াও বসিল না। যেমন শুইয়াছিল, তেমনি পড়িয়া রহিল। সে বাত্রে শাল' ভগিনীপতি কাছাবও খাওয়া হইল না।

সকাল-বেলা দেখা গেল, গঙ্গামণি বাটীতে নাই। এদিকে ওদিকে কিছুক্ষণ খোজাখুঁজিব পব পাচ কহিল, দিদি নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ি চলে গেছে।

স্ত্রীর এই প্রকার আকস্মিক পরিবর্তনের হেতু শিবু মনে মনে বিবেচনা-
ছিল বলিয়া তাহাব বিরক্তিও যেমন উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল, নানিশ
মকদ্দমার প্রতি ঝোঁকও তেমনি খাটো হইয়া আসিতেছিল। সে শুধু
বলিল, চুলোয় যাক, আমার খোজবার দরকার নেই।

বিকাল-বেলা খবর পাওয়া গেল, গঙ্গামণি বাপের বাড়ি যায় নাই।
পাঁচু ভরসা দিয়া কহিল, তা হ'লে নিশ্চয় পিসিমাব বাড়ি চ'লে গেছেন।

তাহাদের এক বড়লোক পিসি ক্রোশ পাঁচ-ছয় দূরে একটা গ্রামে বাস
করিতেন। পূত্ৰা পর্ব উপলক্ষে তিনি মাঝে মাঝে গঙ্গামণিকে লইয়া
যাইতেন। শিবু স্ত্রীকে অভ্যস্ত ভালবাসিত। সে মুখে বলিল বটে,

যেখানে খুসি যাক্ গে! মক্ক গে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে অহুতপ্ত এবং উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। তবুও রাগের উপব দিন পাচ-ছয় কাটিয়া গেল। এদিকে কাজ-কর্ম লইয়া, গরু-বাকুর লইয়া সংসাব তাহার একপ্রকার অচল হইয়া উঠিল। এ টা দিনও আব কাটে না এমনি হইল।

সাত দিনের দিন সে আপনি গেল না বটে, কিন্তু নিজেব পৌরষ বিসর্জন দিয়া, পিসির বাড়িতে গরুব গাড়ী পাঠাইয়া দিল।

পব দিন শূণ্য গাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল সেখানে কেহ নাই। শিব মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

সাবাদিন স্নানাহাব নাই, মডার মন একটা তক্তাপোষেব উপর পড়িয়াছিল, পাচু অভ্যস্ত উত্তেজিতভাবে ঘবে ঢকিয়া কহিল, সামন্তমশাই, সন্ধান পাওয়া গেছে।

শিব ধড়দ করিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, কোথায়? কে খবর দিলে? অন্তথ বিস্তথ কিছু হয় নি ত? গাড়ী নিয়ে চল্ না এখনি তখনে যাই।

পাঁচু বলিল, দিদিব কথা নব—গয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে।

শিবু আবার শুইয়া পড়িল, কোন কথা কহিল না।

তখন পাচু বহুপ্রকারে বুঝাইতে লাগিল যে এ স্ত্রযোগ কোনও মতে হাতছাড়া করা উচিত নয। দিদি ৩ এক দিন আস্বেই, কিন্তু তখন আর এ ব্যাটাকে বাগে পাওয়া যাবে না।

শিবু উদাসকণ্ঠে কহিল, এখন থাক্ গে পাচ। তাগে সে ফিবে আশুক তার পবে—

পাঁচু বাধা দিয়া কহিল, তার পরে কি আর হবে সামন্তমশাই

বয়স্ক দিদি কিরে আস্তে না আস্তে কাজটা শেষ করা চাই। সে এসে পড়লে হয় ত আর হবেই না।

শিবু রাজি হইল। কিন্তু আপনার খালি ঘরের দিকে চাহিয়া পরের উপর প্রতিশোধ লইবার জোর আর সে কোন মতে নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এখন পাঁচর জোর খার করিয়াই তাহার কাজ চলিতেছিল।

পর দিন রাত্রি থাকিতেই তাহারা আদালতের পেয়াদা প্রভৃতি লইয়া বার্ষিক হইয়া পড়িল। পথে পাচু জানাইল, বহু দুঃখে খবর পাওয়া গেছে শান্তু তাহাকে পাচলাব সরকারী পুলের কাছে নাম ভাড়াইয়া ভর্তি করিয়া দিয়াছে—সেইখানেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে।

শিবু ধরাবর চুপ করিয়াই ছিল, তখনও চুপ করিয়া রহিল।

তাহারা গ্রামে যখন প্রবেশ করিল, তখন বেলা দ্বিপ্রহর। গ্রামের এক প্রান্তে প্রকাণ্ড মাঠ, লোক-জন, লোহা-লকড়, কল-কারখানার পরিপূর্ণ—সর্বত্রই ছোট ছোট ঘন বাড়িয়া জন-মজুবেরা বাস করিতেছে অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর একজন কহিল, যে ছেলেটি সাহেবের বাড়ী লেখাপড়া করছে, সে ত ? তার ঘর ঐ যে, বলিয়া একথানা ক্ষুদ্র কুটার দেখাইয়া দিলে, তাহারা গুঁড়ি মারিয়া পা টিপিয়া অনেক কষ্টে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। ভিতরে গয়রামেব গলা শুনিতে পাওয়া গেল। পাচু পুলকে উল্লসিত হইয়া পেয়াদা এবং শিবুকে লইয়া বীরদপে অকস্মাৎ বুটাবেব উন্মুক্ত দ্বার বোধ করিয়া দাঁড়াইবা-মাত্রই তাহার সমস্ত মুখ বিস্ময়ে, স্ফোভে, নিরাশায় কালো হইয়া গেল। তাহার দিদি ভাবাড়িয়া দিয়া একটা হাতপাখা লইয়া বাতাস করিতেছে এবং গয়রা-ভোজনে বসিয়াছে।

শিবুকে দেখিতে পাইয়া গন্ধামনি মাথায় আচন তুলিয়া দিয়া শুধু
ইল, তোমরা একটু জিরিয়ে নিয়ে নদী থেকে নেবে এসে গে, আমি
• হক্ষণ আর এক হাড়ি ভাত চড়িয়ে দিই।

সম্পূর্ণ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্দের পক্ষে

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,

২০৩১১, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিট, কলিকাতা—৬

ব্রহ্মেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-সঙ্কলিত

শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে রচনাবলী

শরৎচন্দ্রের বহু রচনা—অভিভাষণ, প্রবন্ধ, সমালোচনা,

অসমাপ্ত উপন্যাস প্রভৃতি যাহা এযাবৎ

পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই—

তাহাই সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে

নিম্নলিখিত অসমাপ্ত উপন্যাসগুলি ইহাতে আছে—

জাগরণ, রসচক্র, আগামী কাল ।

দাম—পাঁচ টাকা।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

নারী র মূল্য

বহুদিন পরে পুনরায় দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হইয়াছে ।

দাম—দুই টাকা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

১০১/১/১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট • কলিকাতা
